ফয়যানে মদীনা

সেপ্টেম্বর ২০২৫

৭ সেপ্টেম্বর
আকিদায়ে খতমে নবুওয়াত রক্ষা দিবস

২ সেপ্টেম্বর
দাওয়াতে ইসলামী দিবস

মুবারক হোক

- আকিদায়ে খতমে নবুওয়াত এবং কুরআন
- মুমিনের জন্য সব চেয়ে বড় পুরস্কার
- বাগানের ফলের সঠিক পরিমাণ জানিয়ে দিলেন
- হযরত সায়্যিদুনা আওফ বিন মালিক আশজায়ী
- বড়পীরের নোরানী বাণীসমূহ
- ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলাসমূহ

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

ফয়যানে মদীনা

সেপ্টেম্বর ২০২৬

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

আকিদায়ে খতমে নবুওয়াত এবং কুরআন

মাওলানা আবুন নূর রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

আকিদায়ে খতমে নবুওয়াত দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার ওপর উম্মতে মুসলিমার নিরবচ্ছিন্ন সর্বসম্মত ঐক্যমত চলে আসছে। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত এমন রয়েছে যা স্পষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিত ও গবেষণার মাধ্যমে এই সত্যের ওপর প্রমাণ পেশ করে যে, নবী আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন মহান আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূল এবং তাঁর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর কিয়ামত পর্যন্ত কোনো প্রকার নতুন নবী প্রেরিত হবে না। এই মর্মের আয়াতসমূহকে কয়েকটি শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হলো:

(১) খাতামুন্নাবিয়্যীন

পবিত্র কুরআনের সেই বরকতময় আয়াত যাতে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে স্পষ্টভাবে “খাতামুন্নাবিয়্যীন” বলা হয়েছে, তা আকিদায়ে খতমে নবুওয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট, অকাট্য এবং মৌলিক দলিল:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا۠

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন।

(আল-আহযাব, ৪০ নং আয়াতের অধীনে, ২২/৪০)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা নবী আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে “খাতামুন্নাবিয়্যীন” উপাধিতে স্মরণ করে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনিই صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবীগণের শেষ স্তর। “খাতামুন্নাবিয়্যীন”-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এটাই যে, নবুওয়াতের ধারা তাঁর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাধ্যমেই শেষ হয়ে গেছে এবং এখন তাঁর পরে আর কোনো

নতুন নবী আসতে পারেন না। উম্মতে মুসলিমার প্রতিটি যুগের কুরআনের ব্যাখ্যাকার, হাদীস বিশারদ, ফকিহগণ এবং মুতাকাল্লিমগণের এই অর্থের ওপর ঐক্যমত রয়েছে যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর সর্বশেষ নবী এবং খাতামুন্নাবিয়্যীন-এর অর্থ ও মর্মও এটাই।

খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারীরা এই আয়াতের "খাতামুন্নাবিয়্যীন" শব্দের অর্থে বিভিন্ন প্রকার ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও ধোঁকা ভিত্তিক ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে থাকে যা কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণের নির্দেশ ও ঐক্যমত এবং ব্যাখ্যাকার, মুহাদ্দিস, গবেষক, মুতাকাল্লিম ও সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীর বিরোধী। সুতরাং কুরআনের ব্যাখ্যাকার আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (মৃত্যু: ৩১০ হি.), আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী মাওয়ার্দী (মৃত্যু: ৪৫০ হি.), আবু হাসান আলী বিন আহমদ ওয়াহিদী নিশাপুরী শাফেয়ী (মৃত্যু: ৪৬৮ হি.), আবুল মুযাফফর মনসুর বিন মুহাম্মদ মারওয়াজী সামআনী শাফেয়ী (মৃত্যু: ৪৮৯ হি.), মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন বিন মাসউদ বাগভী (মৃত্যু: ৫১০ হি.), আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক বিন গালিব আন্দালুসী মুহারিবী (মৃত্যু: ৫৪২ হি.), সুলতানুল উলামা আবু মুহাম্মদ ইজ্জুদ্দীন আব্দুল আজিজ বিন আব্দুস সালাম সালমী দামেশকী (মৃত্যু: ৬৬০ হি.), নাসেরুদ্দীন আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ বিন ওমর শিরাজী বায়যাবী (মৃত্যু: ৬৮৫ হি.), আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ নাসাফী (মৃত্যু: ৭১০ হি.), আবুল কাসিম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ কালবী গ্রানাডী (মৃত্যু: ৭৪১ হি.), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আরাফাহ ওয়ারগামী মালিকী (মৃত্যু: ৮০৩ হি.), জালালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ মাহাল্লী (মৃত্যু: ৮৬৪ হি.) এবং আবুল সুউদ আল-ইমাদী মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুস্তফা (মৃত্যু: ৯৮২ হি.) رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সহ অন্যান্য অসংখ্য ব্যাখ্যাকারগণ এই আয়াতের তাফসীরে আমাদের প্রিয় প্রভূ মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ও গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন।

(২) দ্বীনের পূর্ণতা ও নবুওয়াতের নেয়ামতের সমাপ্তি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ইসলামের পূর্ণতা, তাঁর নেয়ামতের সমাপ্তি এবং শরীয়তে মুহাম্মদীর কামেল ও পরিপূর্ণ হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঘোষণা নবুওয়াতের পরিসমাপ্তির ওপর অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্পষ্ট দলিল; কারণ যখন দ্বীন তার পূর্ণতায় পৌঁছে গেল, হেদায়েতের নেয়ামত সম্পূর্ণ হলো এবং আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে চিরস্থায়ীভাবে পছন্দনীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে দিলেন, তখন এর পরে আর কোনো নতুন নবী, নতুন ওহী বা নতুন শরীয়তের কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿اَلْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًاؕ﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম।

(আল-মায়েদা, ৩ নং আয়াতের অধীনে, ৬/৩)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতটি বিদায় হজের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং বর্ণনা অনুযায়ী এটি অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৮১ দিন জীবিত ছিলেন এবং এরপর হালাল-হারাম সংক্রান্ত আর কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। মূল কথা হলো; প্রত্যেক নবী নিজ নিজ সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বীনি বিধান নিয়ে আসতেন এবং প্রত্যেক নবী তাঁর পরে আগত নবীর সংবাদ দিতেন, যতক্ষণ না নবী আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রেরিত হলেন এবং তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরিসমাপ্তির সাথেই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করল। যখন "নবুওয়াতের নেয়ামত" সমাপ্ত করে দেওয়া হলো, তখন এরপর আর কোনো নতুন নবী আসতে পারেন না এবং ওহীর ধারাও জারি থাকতে পারে না; কারণ দ্বীনের পূর্ণতা এবং নতুন নবুওয়াত একসাথে হওয়া অসম্ভব। হাফেজ ইবনে কাসীর এই আয়াতের অধীনে স্পষ্টভাবে লিখেছেন:

هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الامة. حيث اكمل تعالى لهم دينهم. فلا يحتاجون الى دين غيره. ولا الى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الانبياء وبعثه الى الانس والجن

"এটি এই উম্মতের ওপর মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত যে, তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর অন্য কোনো দ্বীনের মুখাপেক্ষিতা নেই এবং তাঁদের নবী ছাড়া অন্য কোনো নবীরও প্রয়োজন নেই। এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে খাতামুন্নাবিয়্যীন করেছেন এবং তাঁকে সকল মানুষ ও জ্বীন জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন।"

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, আল-মায়েদা, ৩ নং আয়াতের অধীনে, ৩/২২)

(৩) রিসালাতের বিশ্বজনীনতা ও পরিসমাপ্তি

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালাত সমগ্র মানবজাতি বরং জ্বীন ও মানুষ উভয়ের জন্য বিশ্বজনীন এবং স্থায়ী; তা কোনো বিশেষ জাতি, সময় বা স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং যখন তাঁর রিসালাত সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যথেষ্ট, তখন এরপর অন্য কোনো নবী বা রাসূলের অবকাশ থাকে না। কারণ যদি কোনো নতুন নবী আসেন তবে অবশ্যই তিনি কোনো বিশেষ অঞ্চল বা সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হবেন, যা রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশ্বজনীন রিসালতের পরিপন্থী। নিচে এই আয়াতসমূহ অধ্যয়ন করা যাক:

আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রসূল:

﴿قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, 'হে মানবকুল! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল। (আল-আ'রাফ, ১৫৮ নং আয়াতের অধীনে, ৯/১৫৮)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতটি সূরা সাবার উল্লিখিত আয়াতের সমার্থবোধক এবং তার সমর্থক। নবী আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি মানবজাতিকে সম্বোধন করে তাঁর রিসালাত সকল জ্বীন ও মানুষের জন্য হওয়ার ঘোষণা প্রদান করবেন। স্বয়ং তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বীয় বাণীর মাধ্যমেও তা বর্ণনা করেছেন: اَنَا رَسُولُ مَنْ اَدْرَكْتُ حَيًّا وَمَنْ يولَدُ بَعْدي "আমি তাঁর প্রতিও রাসূল যাকে আমি আমার জীবদ্দশায় পাব এবং তাঁর প্রতিও রাসূল যে আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে।" (আল-তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সাদ, ১/১৬২)

রহমাতুল্লীল আলামীন:

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য।

(আল-আম্বিয়া, ১০৭ নং আয়াতের অধীনে, ১৭/১০৭)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে "আল-আলামীন" শব্দটি তাঁর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রহমতের পরিধি সমস্ত জগত পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এবং এর দাবি হলো, তাঁর ওপর ঈমান আনার নির্দেশও সমস্ত জগতবাসীকে দেওয়া হচ্ছে। অথচ তাঁর পূর্বে

সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী:

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّ نَذِیْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং হে মাহবুব! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন রিসালাত সহকারে, যা সমস্ত জাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়, এবং সতর্ককারীরূপে, কিন্তু অনেকে জানে না। (সাবা, ২৮ নং আয়াতের অধীনে, ২২/২৮)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে "كَآفَّةً لِّلنَّاسِ" (সমগ্র মানুষের জন্য) শব্দটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ তাঁর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবির্ভাব কোনো বিশেষ জাতির জন্য নয় বরং কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল মানুষের জন্য। পূর্ববর্তী সকল নবীগণ নিজ নিজ জাতির নিকট প্রেরিত হতেন, যেমনটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে "আখাহুম" (তাদের ভাই), "ইলা আদ" (আদ জাতির প্রতি) অথবা "ইলা সামুদ" (সামুদ জাতির প্রতি) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা স্পষ্ট। এখন কিয়ামত পর্যন্ত কোনো নতুন নবীর প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই, কারণ মুহাম্মদী রিসালত প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি স্থানের মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে। যদি তর্কের খাতিরে তাঁর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর কোনো নতুন নবী প্রেরিত হতো তবে এর অনিবার্য ফল দাঁড়াত এই যে, তাঁর সাধারণ রিসালত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত, যা স্বয়ং আয়াতের স্পষ্ট মর্মের পরিপন্থী।

এমন কোনো নবী বা রাসূল আসেননি যাঁদের রহমত বা নবুওয়াত বা ঈমানের দাওয়াত সমস্ত জগতবাসীর জন্য ছিল। সুতরাং এখন যদি কেউ বলে যে, মুহাম্মদে আরাবী রহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরেও কোনো নতুন নবী আসতে পারেন, তবে এটি প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্য "রহমাতুল্লিল আলামীন"-এর পরিপন্থী। কারণ এর অর্থ দাঁড়াবে এখন শুধুমাত্র তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওপর ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়। অতএব "রহমাতুল্লিল আলামীন"-এর দাবি এটাই যে, তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর কোনো নতুন নবী আসবে না।

সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী:

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرَاۙ ﴿۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: বড় মঙ্গলময় তিনি, যিনি অবতীর্ণ করেছেন কুরআন আপন বান্দার প্রতি, যাতে তিনি সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন। (আল-ফুরকান, ১ নং আয়াতের অধীনে, ১৮/১)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে নবী আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সতর্ককারীর পদকেও "লিল আলামীন" অর্থাৎ বিশ্বজনীন ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই পদের মাধ্যম হিসেবে স্বয়ং পবিত্র কুরআনকে বলা হয়েছে, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। এই আয়াত এই বিষয়ের দলিল যে, তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সতর্ক করার দায়িত্ব কোনো বিশেষ এলাকা বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং কুরআনের মাধ্যমে তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যেহেতু পবিত্র কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত হেদায়েতের কিতাব এবং এই কুরআনের মাধ্যমেই তাঁর সতর্কবাণী সমস্ত জগতে পৌঁছে যায়, তাই এই বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী সতর্ককারী পদের পর কোনো নতুন নবীর মাধ্যমে নতুন সতর্কবাণীর প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।

কুরআনের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত সতর্ক করা:

وَاُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমার প্রতি এ কুরআনের ওহী এসেছে যেন আমি তা দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং এ যে লোকের নিকট এটা পৌঁছে।

(আল-আনআম, ১৯ নং আয়াতের অধীনে, ৭/১৯)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে "وَمَنْۢ بَلَغَ" (যাদের কাছে এটি পৌঁছাবে) বাক্যটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক; অর্থাৎ শুধুমাত্র বর্তমান সময়ের লোক নয় বরং যে ব্যক্তির কাছেই কুরআনের বাণী পৌঁছাবে, সে-ই মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এই সতর্ক করার গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত, চাই সে কিয়ামত পর্যন্ত যেকোনো যুগে জন্মগ্রহণ করুক না কেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআন এবং এর মাধ্যমে দেওয়া সতর্কবাণী কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ এবং কোনো নতুন নবীর মাধ্যমে নতুন সতর্কবাণীর প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না,

কারণ কুরআন নিজেই কিয়ামত পর্যন্ত এই দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে।

আয়াতসমূহের সারসংক্ষেপ: এই সকল আয়াতের ওপর সামগ্রিক দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট হয় যে, পবিত্র কুরআন নবী আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালাতকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ, বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী মর্যাদা দান করেছে যে, এর পর কোনো নতুন নবী আসার কোনো অবকাশই বাকি থাকে না। সুতরাং "কাফফাতাল লিন্নাস" (সকল মানুষের জন্য), "ইলাইকুম জামিআ" (তোমাদের সবার প্রতি), "রহমাতুল্লিল আলামীন" (সমগ্র জগতের জন্য রহমত), "লিল আলামীন নাযীরা" (সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী), "ওয়া মান বালাগা" (যার কাছেই কুরআন পৌঁছাবে), জ্বীনদের ঈমান আনা ও নিজের জাতির নিকট দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া থেকে প্রমাণিত জ্বীন ও মানুষ উভয়ের জন্য বিশ্বজনীন রিসালত এবং মক্কাবাসীদের জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়েতের কেন্দ্র হওয়ার মতো শব্দ ও বিষয়বস্তুসমূহ এই সত্যকে উজ্জ্বল করে যে, তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাওয়াত প্রতিটি জাতি, প্রতিটি বংশ, প্রতিটি যুগ, প্রতিটি অঞ্চল এবং সকল দায়িত্বশীল সৃষ্টির ওপর পরিব্যাপ্ত। অতএব যদি তর্কের খাতিরেও তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর কোনো নতুন নবী প্রেরিত হতো তবে তাঁর ওপর ঈমান আনাও মুক্তির জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ত, যার ফলে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর রিসালত সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য যথেষ্ট হওয়া আর থাকত না। এমন অবস্থায় "কাফফাতাল লিন্নাস"-এর ব্যাপকতা, "ইলাইকুম জামিআ"-এর অন্তর্ভুক্তি, "রাহমাতুল্লিল আলামীন"-এর বিশ্বজনীন রহমত, "লিল আলামীন নাযীরা"-এর চিরস্থায়ী সতর্ককারী পদ, "ওয়া মান বালাগা"-এর কিয়ামত পর্যন্ত চলমান কুরআনী সতর্কবার্তা এবং জ্বীন ও মানুষ উভয়ের জন্য মুহাম্মদী রিসালাতের পূর্ণাঙ্গতা সবগুলোই তাদের পূর্ণ অর্থ ও মহিমার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

এজন্য এই সকল আয়াতের সম্মিলিত দাবি এটাই যে, নবী আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালত ও নবুওয়াতই কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বীনদের জন্য যথেষ্ট, পূর্ণাঙ্গ, বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী; আর এই কারণেই তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পরে কোনো নতুন নবী বা নতুন নবুওয়াতের কোনো অবকাশ নেই।

হাদীসের ব্যাখ্যা

মুমিনের জন্য সব চেয়ে বড় পুরস্কার

মাওলানা ইজায নাওয়ায আত্তারী মাদানী

হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমরা নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে আমাদের বললেন:

اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهٖ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَّا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا۔

অনুবাদ: তোমরা অবশ্যই তোমাদের দয়ালু প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে, যেভাবে তোমরা এই চাঁদটিকে দেখছ যে, তা দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না। যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয়, তবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযসমূহের (অর্থাৎ ফজর ও আসর) ক্ষেত্রে কখনো পরাজিত (অলসতার শিকার) হয়ো না। (বুখারী, ৪/৩৩৪, হাদিস: ৪৮৫১-৭৪৩৪)

জান্নাতবাসীদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত

আল্লামা ইবনে কামাল পাশা হানাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه উল্লিখিত হাদীস শরীফের অধীনে ‘শরহে রিয়াদুস সালিহীন’-এ বলেন: পরকালে মুমিনগণ মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন, এর ওপর আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত ঐক্যমত রয়েছে। কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবীগণের ঐক্যমত এবং সলফে সালেহীনগণের বর্ণনা দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, মুমিনগণ পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন। বিশ জন সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ থেকে এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআনের আয়াতসমূহ তো এই বিষয়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। (আল-ফাওয়ায়িদুল মুতারা'আতুল হিয়াদ, ৫/৫৬, হাদীস: ১০৫১ এর অধীনে)

শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: সকল সত্যপন্থীদের এই বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, পরকালে মুমিনগণ আল্লাহর দর্শনের সম্পদ লাভে ধন্য হবেন। মানুষ, ফেরেশতা, জ্বীন, নর, নারী সকলেই এই নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত হবেন। মহান আল্লাহর দর্শনের এই মহান নেয়ামত দ্বারা শুধুমাত্র জান্নাতীরাই সর্বদা সম্মানিত হবেন; তবে হাশরের ময়দানে মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সবাই দেখতে পাবে, অতঃপর কাফেররা চিরতরে বঞ্চিত হবে এবং চিরস্থায়ী আক্ষেপ ও অনুশোচনা তাদের

ভাগ্যে জুটবে। নিয়মিত নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর দর্শন লাভের যোগ্যতা তৈরি হয়। আল্লাহর দর্শনের সময় এমন হবে না যে, কেউ দেখবে আর কেউ দেখবে না, বরং পুর্ণিমার চাঁদ যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃশ্যমান হয় এবং বিপুল জনসমাবেশও কোনো কষ্ট ছাড়াই তা দেখতে পায়, তেমনি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দর্শনও অত্যন্ত স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হবে। সেখানে ভিড়ের কারণে কারো দেখতে কোনো কষ্ট বা বাধা সৃষ্টি হবে না। (আশআতুল লুমআত, ৪/৪৪৮, ৪৪৯)

সদরুশ শরীয়াহ মুফতি আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পার্থিব জীবনে আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করা নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য সুনির্দিষ্ট, আর পরকালে প্রতিটি সুন্নী মুসলমানের জন্য তা সম্ভব বরং নিশ্চিত। রইল অন্তরের দর্শন বা স্বপ্নে দেখা; এটি অন্যান্য নবীগণ এমনকি ওলীগণের জন্যও অর্জিত হয়।

(বাহারে শরীয়ত, ১/২০, ২১)

উল্লিখিত হাদীসে বিদ্যমান উপমার ব্যাখ্যা:

হাদীস শরীফে রয়েছে: "তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি দেখবে যেমন এই চাঁদকে দেখছ।" অর্থাৎ পরকালে আল্লাহ পাকের দর্শন এমনভাবে সংশয়াতীত হবে যেমন চাঁদের দর্শন সংশয়াতীত হয়। (আল্লাহ পাকের সত্তা দিক, স্থান এবং সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, তাই এখানে উপমা দ্বারা) এটি কক্ষনো উদ্দেশ্য নয় যে—চাঁদ যেমন একটি নির্দিষ্ট দিক ও সীমানার মধ্যে সামনে দেখা যায়, আল্লাহ পাকের সত্তাও তেমনি হবে।

(আশআতুল লুমআত, ৪/৪৪৯)

ফজর ও আসরে অলসতা থেকে বেঁচে থাকা

'লুমআত শরহে মিশকাত'-এ রয়েছে: "তোমরা ফজর ও আসরের নামাযে পরাজিত হয়ো না অর্থাৎ অলসতা ও আরামপ্রিয়তা যেন তোমাদের ওপর এমনভাবে চড়াও না হয় যে, তোমরা এই দুটি নামায ছেড়ে দাও। ফজর ও আসরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব, অন্যথায় প্রতিটি নামাযের বিধান একই যে, সেগুলোর কোনোটিতেই অলসতা করা যাবে না।"

(লুমআতুত তানকীহ, ৯/১৩৮, হাদীস: ৫৬৫৫ এর অধীনে)

এই দুটি নামাযকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার একটি কারণ হলো; আল্লাহর দর্শন এই সময়গুলোতেই হবে। (আশআতুল লুমআত, ৪/৪৫০) এই দুটি নামাযের নিয়মিত আদায় ঐ দর্শন লাভের যোগ্যতা ও সামর্থ্য তৈরি করবে।

(মীরাতুল মানাজীহ, ৭/৫১৮)

ফজর ও আসরের মহান প্রতিদান

'ফয়যুল বারী'-তে রয়েছে: এই দর্শন কীভাবে হবে, এর ধরণ কেমন হবে, সত্তার দর্শন হবে নাকি জ্যোতির প্রকাশ হবে; এই বিষয়ে একজন মুসলমানের জন্য এতটুকু জানা ও বিশ্বাস করাই যথেষ্ট যে, দর্শন হবে। রইল এর হাকিকত বা ধরণ; তা বর্ণনা করা সম্ভব নয় এবং বর্ণনা করা যায়ও না, আর এর গভীরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহর দর্শনের বর্ণনার সময় ফজর ও আসরের বর্ণনার সামঞ্জস্য এই যে, নামায হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং আসর ও ফজরের গুরুত্ব ও মহিমা অনেক বেশি। কারণ

এই সময়টি ফেরেশতাদের একত্রিত হওয়ার এবং আমলনামা উপরে ওঠার সময়। অতএব এমন শ্রেষ্ঠ ও মহান আমলের প্রতিদানও শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত; আর তা হলো মহান আল্লাহর দর্শন যা পরকালের সকল নেয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। (ফয়যুল বারী, ৩/২৪৮)

প্রতিটি মুমিন আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবে

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: দুনিয়াতে বান্দা আল্লাহ তায়ালাকে অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ হৃদয়ের নূর দিয়ে দেখে এবং তাঁকে চেনে ও জানে; পরকালে তাঁকে চাক্ষুষ দৃষ্টি অর্থাৎ চোখের নূর দিয়ে দেখবে, কারণ সেখানে চাক্ষুষ দৃষ্টির মাঝে অন্তর্দৃষ্টিও থাকবে। দুনিয়াতে স্বপ্নে আল্লাহর দর্শন হতে পারে বরং হয়। আমাদের ইমামে আজম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বপ্নে একশত বার রবকে দেখেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বপ্নে আল্লাহ পাককে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: হে ইলাহী! কোন ইবাদতটি শ্রেষ্ঠ? ইরশাদ হলো: কুরআন তেলাওয়াত। দ্বিতীয়বার দেখে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: হে ইলাহী! অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করা শ্রেষ্ঠ নাকি না বুঝে? ইরশাদ হলো: উভয়ভাবেই শ্রেষ্ঠ। এই হাদীসটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য দলিল যে, মুমিনগণ মহান প্রতিপালককে হাশরের ময়দানেও চাক্ষুষ দেখবেন এবং জান্নাতেও দেখতে থাকবেন। (মীরাতুল মানাজীহ, ৭/৫১৬, ৫১৭)

একজন রাসূল প্রেমিকের ভালোবাসা মাখা শৈলী

হাদীস শরীফে রয়েছে: “তাজদারে রিসালাত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন।” চাঁদ দেখার এই ভঙ্গিটি একজন রাসূল প্রেমিক কত প্রেমময় ঢঙে বর্ণনা করেছেন, তা লক্ষ্য করুন। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন) অর্থাৎ আল্লাহ পাকের চাঁদ আকাশের চাঁদের দিকে তাকালেন। ডুবে যাওয়া ও গ্রহণ লাগা চাঁদের দিকে সেই চাঁদ তাকালেন যা কখনো অস্ত যায় না এবং যাতে গ্রহণ লাগে না। বাহ্যিক জগতকে আলোকিত করা চাঁদের দিকে সেই চাঁদ তাকালেন যিনি হৃদয় ও প্রাণ, রুহ ও ঈমানকে আলোকিত করেন। রাতে চমকানো চাঁদের দিকে সেই চাঁদ তাকালেন যিনি অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত দিন-রাত সর্বদা চমকান এবং চমকাতে থাকবেন। আমি আর কী বলব, আমি তো শব্দই খুঁজে পাচ্ছি না;

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى بَدْرِ النُّبُوَّةِ وَشَمْسِ الرِّسَالَةِ
صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ

অন্যভাবে বলা যায় যে, সূর্যের আলোতে আলোকিত হওয়া ঐ চাঁদের দিকে সেই চাঁদ তাকালেন যিনি খোদ সূর্যকেও আলোকিত করেন এবং যিনি হৃদয়ের আকাশে দিনের সূচনা ঘটান। (মীরাতুল মানাজীহ, ৭/৫১৭) আল্লাহ পাক আমাদের পরকালে তাঁর দর্শন লাভের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করুন। وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদে আরাবী ﷺ এর কথোপকথনের ধরণ

মাওলানা নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

সঠিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা সুদৃঢ় জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। যার জ্ঞানগত গভীরতা যত বেশি হয়, তার কথা তত চমৎকার, উপকারী এবং ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। আসুন! এই মৌলিক বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা পবিত্র কুরআন খুলি এবং সূরা আর-রহমানের প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করি:

اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ পরম দয়ালু,আপন মাহবুবকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানবতার প্রাণ মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন। (আর-রহমান ১ থেকে ৪ আয়াত)

আর যিনি পবিত্র কুরআন শিখিয়েছেন, তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহান রব ইরশাদ করেন:

وَ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং আমি আপনার উপর এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি,যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ। (আন-নাহল, ৮৯)

এখন একটু এই বিষয়ে চিন্তা করুন যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক স্বয়ং যাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং কুরআনের মতো অলৌকিক বাণী যার ওপর অবতীর্ণ করেছেন, তাঁর কথোপকথনের সৌন্দর্য, আকর্ষণ ও পূর্ণতার অবস্থা কেমন হবে! মুস্তফা করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথাবার্তা সংরক্ষিত করতে, বুঝতে এবং এর ওপর চিন্তা-গবেষণা করতে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সায়্যিদে আলম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসসমূহ আমাদের শেখায় যে, কখন কথা বলা উচিত, কীভাবে বলা উচিত এবং কী ও কতটুকু বলা উচিত? আসুন! আল্লাহর সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথোপকথন শৈলী নিয়ে অধ্যয়ন করি:

(১) প্রয়োজন অনুযায়ী কথা বলা

আল্লাহর শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। (শামাইলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা:১৩৫)

রহমতে আলম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নীরবতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এভাবে: যে চুপ থাকল, সে মুক্তি পেল। (তিরমিযী, হাদীস: ২৫০৯, ৪/২২৫)

যে নিরাপত্তা চায়, তার জন্য নীরবতা আবশ্যক। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, হাদীস: ৩৫৯৫, ৩/২৭১)

নীরবতা হলো চরিত্রের সর্দার।

(মুসনাদুল ফিরদাউস, হাদীস: ৩৬৬৬, ২/৩৬)

পুণ্যের কথা ছাড়া তোমাদের ওপর দীর্ঘ নীরবতা আবশ্যক, কারণ এটি শয়তানকে তোমাদের থেকে দূরে রাখবে এবং দ্বীনি বিষয়ে তোমাদের সহায়ক হবে।

(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৩৬২, ১/২৮৯)

এ থেকে জানা গেল যে, অসময়ে কথা বলার চেয়ে যথাসময়ে কথা বলা উত্তম। কেননা যথাসময়ে কথা বলা মানুষের বুদ্ধিমত্তা আর অসময়ে কথা বলা মূর্খতার পরিচয়। আমাদের উচিত শব্দসমূহকে সম্পদের ভাণ্ডার মনে করা এবং সেখানেই ব্যয় করা যেখানে প্রয়োজন।

(২) কথোপকথনের শুরু ও সমাপ্তি

আমাদের আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথোপকথনের শুরুও আল্লাহর নামে করতেন এবং সমাপ্তিও আল্লাহর নামেই করতেন।

(শামাইলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা:১৩৫)

এর উদ্দেশ্য হলো; তিনি কথা শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ শরীফ পড়তেন এবং কথা শেষ করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলতেন।

(আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ আলাশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা:৩৫৬)

(৩) কথোপকথনের বিষয়বস্তু

আল্লাহ পাক সায়্যিদে আলম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা এবং আত্মার পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রেরণ করেছেন। তাই তাঁর কথোপকথনের বিষয়বস্তু ছিল সেই প্রতিটি জিনিস যার প্রয়োজন মানুষের ছিল। এই কারণেই আমাদের সামনে বিদ্যমান হাদীসের ভাণ্ডার প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মানুষের বিশ্বাসগত, শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ। আমাদের উন্নতির শিখরে পৌঁছানো এবং পতন থেকে মুক্তির রহস্যও রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসসমূহ বোঝা এবং সেগুলোর ওপর আমল করার মধ্যে নিহিত। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে 'দাওয়াতে ইসলামী' ৪৫ বছর ধরে নববী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে অসংখ্য মানুষের চরিত্র সুন্নাতের ঢাঁচে ঢেলে সাজানো হয়েছে। দাওয়াতে ইসলামীর প্লাটফর্মগুলোতে অনেক যুবক হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন ও প্রচারে অংশ নিচ্ছেন।

(৪) কথোপকথনের শৈলী

কার্যকর কথোপকথনের ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাচনভঙ্গি যদি চমৎকার হয় তবে কথা হৃদয়ে গেঁথে যায়। তাই:

১. তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুব দ্রুত কথা বলতেন না বরং একটি বাক্যের পর থামতেন যাতে শ্রোতা চিন্তা করে বুঝতে পারে। এই গতি এমন ছিল যে, কেউ যদি শব্দ গণনা করতে চাইত তবে গণনা করতে পারত। যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের মতো দ্রুত কথা বলতেন না। (বুখারী, হাদীস: ৩৫৬৮, ২/৪৯১)

তিনি কথা এমনভাবে বলতেন যে, কেউ গণনা করতে চাইলে তা গুনতে পারত।

(বুখারী, হাদীস: ৩৫৬৭, ২/৪৯১)

২. আল্লাহর শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথোপকথন শৈলী এতই স্পষ্ট ও নির্মল ছিল যে, কথা পুরোপুরি বুঝে আসত। (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ আলাশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা:৩৫৬)

৩. রহমতে আলম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। যেমন হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: হুজুর আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোনো কথা (কঠিন অর্থ, অপরিচিত শব্দ বা শ্রোতাদের আধিক্যের কারণে দয়া ও মমতা প্রদর্শন করে) তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে তাঁর কথাটি বোঝা যায়। (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ আলাশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৩৫৩)

প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কোনো কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করার অনেক উদাহরণ হাদীস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে এবং ঐ সকল অথবা অধিকাংশ হাদীসকে সামনে রাখা ব্যক্তির নিকট এই বিষয়টি গোপন নয় যে, সেগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটি হাদীসে পুনরাবৃত্তি করা কথাটি ইসলামের কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে। পুনরাবৃত্তিমূলক কথোপকথনের এই পদ্ধতির ফলস্বরূপ সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم এগুলো খুব ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করেছিলেন এবং তাঁদেরই অসিলায় আমাদের কাছে এই হাদীসের ভাণ্ডার ইসলামের জ্যোতির্ময় শিক্ষারূপে পৌঁছেছে।

(মুস্তাদরাক, হাদিস: ৪৩৩৩, ৩/৫৪৪)

(৫) শব্দ চয়ন

আল্লাহর শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে 'জাওয়ামিউল কালিম' (সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ শব্দ) নামক মুজেযা দান করা হয়েছিল। যার কারণে তিনি দীর্ঘ বক্তব্যকে সামান্য কিছু শব্দের মধ্যে গুছিয়ে নিতে পারতেন। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ অর্থ ও মর্মের সাগরের ন্যায় হয়ে যেত। আজকেও যে ব্যক্তি পবিত্র হাদীস পাঠ করে, সে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কথাগুলোর প্রভাব নিজের হৃদয়ে অনুভব করে।

(৬) বাচনভঙ্গি ও স্বর

চমৎকার কথোপকথন শৈলী শব্দের মধ্যে মিষ্টতা সৃষ্টি করে দেয়। শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সুন্দর বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত উম্মে মাবাদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন: যখন হুজুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নীরব থাকতেন তখন তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর ও মর্যাদাবান মনে হতো, আর যখন কথা বলতেন তখন তাঁর চেহারা নূরানী ও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কথা ছিল মধুর, তা নিরর্থক ছিল না এবং অহেতুকও ছিল না। তাঁর কথাগুলো যেন মুক্তার মালার ন্যায় ছিল, যেখান থেকে মুক্তা ঝরছিল। (শামাইলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ১৩৫)

রহমতে আলম ﷺ -এর অতুলনীয় বাচনভঙ্গির কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

১) তাঁর স্বরে কর্কশতা ছিল না।

(বুখারী, হাদীস: ২৭৬৮, ২/২৪৩; হাদীস: ৬০৩৮, ৪/১১০)

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সেবায় কাটিয়েছি,

কিন্তু তিনি কখনো আমার ওপর রাগান্বিত হননি এবং কখনো আমাকে ধমক দেননি। এমনকি এটিও বলেননি যে, এই কাজটি তুমি কেন করলে? অথবা কেন করলে না?

২) তাঁর বাচনভঙ্গি অবমাননা ও তুচ্ছজ্ঞান থেকে মুক্ত ছিল। একবার একজন গ্রাম্য লোক মসজিদে প্রবেশ করে এক কোণে প্রস্রাব করতে শুরু করল। সাহাবায়ে কেরাম তাকে বাধা দিতে উদ্যত হলে হুজুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: তাকে বাধা দিও না, ছেড়ে দাও। (মুসলিম, হাদীসঃ পৃষ্ঠাঃ ৬৬১, ১৩৩)

যখন সে প্রস্রাব শেষ করল, তখন তাকে ডেকে বললেন: এই মসজিদগুলো প্রস্রাব ও নোংরা করার জন্য নয়, এগুলো আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য।

(ইবনে মাজাহ, হাদীসঃ ৫২৯, ১/৩০০)

একটি বর্ণনা অনুযায়ী, সেই গ্রাম্য লোক হুজুরের এই আচরণে এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে, সে তাঁর প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বর্ণনা এভাবে দিয়েছে: فَقَامَ اِلَيَّ بِاَبِي وَاُمِّي، فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ অর্থাৎ "আমার পিতা-মাতা তাঁর ওপর উৎসর্গ হোক! তিনি আমাকে ধমকও দেননি এবং গালিও দেননি।"

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/১৯৪)

যেহেতু তিনি নতুন মুসলমান হয়েছিলেন এবং এই বিষয়ে জানতেন না, তাই তাঁর দ্বারা এমনটি হয়েছিল। (মীরাতুল মানাজীহ, ১/৩২৫-৩২৬) নতুবা শরয়ী বিধান হলো; মসজিদে প্রস্রাব করা হারাম।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৬৪৫)

৩) রহমতে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সঠিক কথা শেখানোর জন্য অথবা কারো ভুল সংশোধন করার জন্যও বাচনভঙ্গি নম্র রাখতে শিখিয়েছেন। যেমন হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি হুজুরের পেছনে নামায পড়ছিলাম, এমন সময় কারো হাঁচি আসল এবং আমি নামাযের মধ্যেই يَرْحَمُكَ الله বলে ফেললাম। লোকজন আমার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাতে লাগল। আমি বললাম: তোমাদের কী হয়েছে? আমার দিকে কেন দেখছ? এতে লোকজন নিজেদের ঊরুতে হাত চাপড়ে আমাকে চুপ করতে সংকেত দিল, আমি চুপ হয়ে গেলাম। নামায শেষ হলে হুজুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ডাকলেন। তাঁর ওপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষক আর কাউকে দেখিনি। তিনি আমাকে প্রহারও করেননি, গালিও দেননি। বরং বললেন: এই যে নামায, এতে মানুষের সাধারণ কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। নামায তো তাসবীহ, তাকবীর এবং তেলাওয়াতের নাম।

(মুসলিম, হাদীসঃ ১১৯৯, ২১৫ পৃষ্ঠা)

(৭) কথোপকথনের সময় মৃদু হাসি

হযরত উম্মে দারদা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا হযরত আবু দারদা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -এর সম্পর্কে বলেন: তিনি কথা বলার সময় মৃদু হাসতেন। আমি তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছি যে, তিনি কথা বলার সময় মৃদু হাসতেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীসঃ ২১৭৯৪, ৮/১৭২)

(৮) নেয়ামতের আলোচনা

নেয়ামত যদি সামান্যও হতো, তবুও রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে তার গুরুত্ব বর্ণনা করতেন। মুখে সেই নেয়ামত পাওয়ার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং

আমলের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজে তা ব্যয় করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কখনো কোনো নেয়ামতের নিন্দা করতেন না, কারণ প্রতিটি নেয়ামত মহান আল্লাহই দান করেন। (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ আলাশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা:৩৫৩)

খাবার কত বড় নেয়ামত! রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচরণ ছিল এই যে, তিনি কখনো খাবারের কোনো ত্রুটি ধরতেন না। যদি পছন্দ হতো তবে গ্রহণ করতেন, আর না হলে খেতেন না। (বুখারী, হাদীস: ৫৪০৯, ৩/৫৩১)

কথোপকথনের কৌশল আজ একটি দক্ষতা (স্কিল) হিসেবে পড়ানো হয়। বহু মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই কৌশল শেখে। প্রযুক্তি সারা বিশ্বের কাছে নিজের কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেক সহজ মাধ্যম তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু এতসব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব প্রতিদিন নতুন কোনো সংকটের সম্মুখীন হয়। আর যখন এই সংকটের মূল উৎস খোঁজা হয়, তখন স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, এর প্রধান কারণ হলো মন্দ উদ্দেশ্যে বলা কথা ও করা কাজ। মহান আল্লাহ পুরো পৃথিবীকে সব ধরনের সংকট থেকে উত্তরণের জন্য এই শ্রেষ্ঠ মূলনীতি দিয়েছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলের অনুসরণই উত্তম।

(আল-আহযাব, ২১ আয়াতের অধীনে, ২১/২১)

এই আয়াতের ওপর আমল করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কথোপকথনের শৈলীসহ আল্লাহর শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে অনেক কঠিন সমস্যা দূর হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে প্রশান্তি আসবে, সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্ক্ষার চেতনা বৃদ্ধি পাবে এবং লোভ, লালসা ও প্রতারণার মতো ঘৃণ্য স্বভাবগুলো নির্মূল হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সীরাতে মুস্তফা অনুসরণ করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সর্বশেষ নবীর অনন্য মুজিযা

বাগানের ফলের সঠিক পরিমাণ জানিয়ে দিলেন

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে অসংখ্য মুজেযা দান করেছেন। এই সকল অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষের হৃদয়ে তাঁর রিসালাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তেমনি অন্যদিকে মুমিনদের ঈমান আরও মজবুত হয়। আসুন! আজ আমরা হুজুর আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এমনই একটি চমৎকার অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে জানি।

হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন: আমরা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে তাবুক যুদ্ধের বছর বের হলাম। যখন আমরা ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে পৌঁছালাম, তখন সেখানে একজন নারী তাঁর বাগানে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাহাবীগণকে বললেন: "এই বাগানের ফলনের একটি অনুমান করো।" সাহাবীগণ কিছু না কিছু অনুমান করলেন এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেও অনুমান করে বললেন যে, এর ফলন হবে দশ 'ওসক' (এক প্রকার পরিমাপ)। এরপর তিনি ঐ নারীকে বললেন: اِنۡ شَآءَ اللّٰه আমি যখন ফিরে আসব ততক্ষণ তুমি এই বাগানের ফলনের হিসাব সংরক্ষণ করবে (অর্থাৎ ফল পেড়ে ওজন করে সেই ওজন মনে রাখবে)।" এরপর আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম এবং তাবুক পৌঁছালাম। অতঃপর (তাবুকের কাজ শেষ করে) তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফিরে আসছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। যখন পুনরায় ওয়াদিউল কুরা-তে পৌঁছালেন, তখন তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ নারীকে জিজ্ঞেস করলেন:

"তোমার বাগানের ফলন কতটুকু হয়েছে?" সে ঠিক সেই দশ 'ওসক'-[১]এর পরিমাণই জানাল যা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুমান করে বলেছিলেন।[২]

নিশ্চিতভাবেই এটি হুজুরের একটি মুজেযা যে, তাঁর অনুমান এতটাই নির্ভুল ছিল যে, তাতে এক রত্তিও পার্থক্য হয়নি। এটি নিছক কোনো সাধারণ অনুমান ছিল না, অন্যথায় কিছু কমবেশি হতো; বরং এটি ছিল তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান।

মুমিনের উচিত প্রতিটি কাজে সত্যবাদিতা অবলম্বন করা।

ভবিষ্যতে কোনো কাজের পরিকল্পনা করার সময় اِنْ شَآءَ الله বলা উচিত, কারণ প্রতিটি কাজ মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই পূর্ণ হয়।

নিজের আর্থিক ও ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ লিখে রাখা উচিত যাতে পরবর্তীতে কোনো মতভেদ বা দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হতে না হয় এবং যাকাত ইত্যাদির হিসাব করতেও সুবিধা হয়।

সফর, ব্যস্ততা বা অন্য কোনো দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও নিজের কথা রক্ষা করা উচিত।

মানুষের উচিত সে যা বলবে বা যার সাথে যে অঙ্গীকার করবে তা মনে রাখা এবং সময়মতো সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা।

অধীনস্থদের মানসিক সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং সুপ্ত দক্ষতাগুলো সময় সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে যাচাই করা উচিত যাতে প্রয়োজনবোধে তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ নেওয়া যায় অথবা তাঁদের কর্মদক্ষতার ওপর ভরসা করা যায়।

ছোট বা সাধারণ মনে হওয়া বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তাই সেগুলোতেও দায়িত্বশীলতা ও সতর্কতার পরিচয় দেওয়া উচিত।

অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে আগ্রহ দেখানোর উদ্দেশ্য হতে হবে তাঁদের কল্যাণ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা, অনর্থক অনুসন্ধান নয়।

অন্যের বিষয়ে শুধুমাত্র তখনই আগ্রহ দেখানো উচিত যখন সে এতে বিরক্ত হবে না।

নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য অথবা মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে নিজের দক্ষতা ও পূর্ণতা অন্যদের সামনে প্রকাশ করা দোষের কিছু নয়।

বড়দের উচিত প্রয়োজনীয় বিষয়ের হিসাব-নিকাশ রাখা এবং নিজেদের কথা ও চুক্তিগুলো পূর্ণ করা যাতে ছোটরা তাঁদের আচরণ থেকে ভালো কিছু শিখতে পারে।

---

১. 'ওসক' শস্য বা ফল পরিমাপের একটি প্রাচীন একক। এক 'ওসক' সমান ৬০ 'সা' আর এক 'সা' আনুমানিক সাড়ে চার সেরের সমান।

২. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩৯/১৬, হাদীসঃ ২৩৬০৪

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

(১) সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবী কে?

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ নবীর নাম বলে দিন, সাথে 'পয়গম্বর' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: সর্বপ্রথম নবী আমাদের প্রিয় আক্বা, মদীনাওয়ালা মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সর্বশেষ নবীও সরকারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তবে এই পৃথিবীতে আগমনকারী সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এবং সবার শেষে আগমনকারী হলেন আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। 'পয়গম্বর' শব্দের অর্থ হলো; বার্তা পৌঁছানো ব্যক্তি।

(মাদানী মুযাকারা, ১০ যুলকাদা ১৪৪০ হিজরি)

(২) হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام এর বিবাহ বর্জন

প্রশ্ন: হযরত ইয়াহইয়া এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام কি বিবাহ করেছিলেন?

উত্তর: এই উভয় ব্যক্তিত্ব অবিবাহিত ছিলেন, তাঁরা বিবাহ করেননি। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বর্তমানে আসমানে অবস্থান করছেন, যখন তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন বিবাহ করবেন। (বাহারে শরীয়ত, ১/১২২, ১২৩; মাদানী মুযাকারা, ১ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি)

(৩) আজওয়া খেজুরের গাছ জন্মানোর বিষয়

প্রশ্ন: একজন ইসলামী ভাইয়ের মা ৩০ বছর আগে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে নিয়ে আসা খেজুরের আঁটি একটি টবে লাগিয়েছিলেন যা বর্তমানে বিশাল গাছে পরিণত হয়েছে। এই গাছটির কি মদীনা থেকে আসা খেজুরের মাধ্যমে মদীনার সাথে কোনো বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে? যেহেতু মুসলমানগণ মদীনার খেজুরের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং অবশ্যই তা করাও উচিত, তবে কি এই গাছের খেজুরগুলোকেও একইভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা আবশ্যক হবে?

উত্তর:

ইশক দে ঝাল্লে ই নম্বর লে গয়ে
আকল মান্দাঁ এবেঁ উমারাঁ গালিয়্যাঁ।

দুনিয়ার যেকোনো দেশ থেকে কোনো জিনিস আসুক তা ভিন্ন কথা, কিন্তু যে জিনিস মদীনার অলিগলি ঘুরে আসে আমরা তাকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকি। মদীনা থেকে আসা আজওয়া খেজুরের আঁটি থেকে জন্মানো গাছের অবশ্যই সম্মান করা হবে, কারণ এর সাথে নিশ্চিতভাবেই মদীনার অলিগলির সম্পর্ক রয়েছে। তবে মদীনা শরীফের আজওয়া খেজুর সম্পর্কে হাদীস শরীফে যে সকল ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা (এই গাছের খেজুরের ক্ষেত্রে) অর্জিত হবে না। (মাদানী মুযাকারা, ১৫ জমাদিউল আখিরা ১৪৪৪ হিজরি, সামান্য পরিবর্তনসহ)

(৪) পবিত্র কুরআনের গিলাফ ধোয়া পানি কোথায় ফেলা উচিত?

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআন যে গিলাফে রাখা হয়, সেই গিলাফ যদি ধোয়া হয় তবে সেই পানি কোথায় ফেলা উচিত?

উত্তর: সেই পানি কোনো সম্মানজনক স্থানে ফেলা উচিত। যেমন সমুদ্র, নদী, খাল অথবা এমন কোনো খোলা ময়দানে যেখানে মানুষের পা পড়ার সম্ভাবনা নেই। টবে ফেলা উচিত নয়, কারণ আমাদের এখানে গাছের টবের মাটিতে গরুর গোবর ও ছাগলের বিষ্ঠাও দেওয়া হয় যা নাপাক। হ্যাঁ! যেখানে পানি শুকিয়ে যায়, যেমন কোনো দেয়াল অথবা বাড়ির ছাদ ইত্যাদি স্থানে সেই পানি ফেলা যেতে পারে।

(মাদানী মুযাকারা, ২ সফরুল মুযাফফর ১৪৪২ হিজরি)

(৫) প্রতিটি নামাযের সাথে কাযা নামায আদায় করা কেমন?

প্রশ্ন: প্রতিটি নামাযের সাথে কি কযা নামায পড়া যেতে পারে?

উত্তর: আজীবন কাযা (কাযা-এ-উমরী) আদায়কারী কেউ কেউ এমনটি করে থাকেন, যেমন ফজরের কাযা ফজরের সময়, যোহরের কাযা যোহরের সময় আদায় করেন। যদিও এভাবেও কাযা আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, যাঁর ওপর কাযা নামায আবশ্যক তাঁর জন্য তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন যেমন খাওয়া, পান করা, উপার্জন করা এবং ঘুমানো ইত্যাদি ছাড়া অবশিষ্ট যে সময় পাওয়া যায়, তাতে নিজের কাযা নামাযসমূহ আদায় করতে থাকা উচিত।

(মাদানী মুযাকারা, ২ মহররম ১৪৪২ হিজরি)

(৬) শিশুদের জন্য ধৈর্যের ক্ষেত্রসমূহ

প্রশ্ন: শিশুরা কোন বিষয়গুলোতে ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব লাভ করতে পারে?

উত্তর: যে সকল বিষয়ে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা দুশ্চিন্তা হয় সেগুলোতে ধৈর্য ধরো। যেমন তোমাদের বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু তোমাদের মা 'খিচুড়ি' খেতে দিলেন, এতে তোমাদের কষ্ট হবে; কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধরে তা খেয়ে নাও এবং সওয়াব অর্জন করো। একইভাবে তোমাদের কোনো খেলনা প্রয়োজন ছিল কিন্তু মা বললেন: "আমার কাছে টাকা নেই, আমি এত

দামী খেলনা কিনে দিতে পারব না”, এটি শুনে তোমাদের কষ্ট হবে; কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধরো এবং ছোট কোনো খেলনা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকো। তদ্রূপ তুমি মাকে বললে যে, আমার অমুক পোশাকটি পরতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু হতে পারে মা তোমাকে সাধারণ এবং কাঙ্ক্ষিত পোশাকের চেয়ে কম দামী কোনো পোশাক দিলেন; তখন জেদ না করে ধৈর্য ধরে সেটি পরে নাও, اِنْ شَآءَ اللّٰہ الْکَرِیْم সাওয়াব পাবে।

(মাদানী মুযাকারা, তারাবীহ নামাযের পর, ২৪ রমজান ১৪৪১ হিজরি)

(৭) বিবাহে মহিলাদের সাক্ষী হওয়া

প্রশ্ন: বিবাহে কি মহিলারা সাক্ষী হতে পারেন?

উত্তর: বিবাহে দুইজন জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান পুরুষ অথবা একজন মুসলমান জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং দুইজন মুসলমান জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা সাক্ষী হতে পারেন। বিবাহে শুধুমাত্র মহিলারা সাক্ষী হতে পারেন না। (বাহারে শরীয়ত, ২/১১, ১২; মাদানী মুযাকারা, ৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি)

(৮) ফুসফুস খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: হালাল প্রাণীর ফুসফুস খাওয়া হালাল কি না?

উত্তর: ফুসফুস খাওয়া হালাল।

(মাদানী মুযাকারা, ১০ যিলহজ ১৪৪১ হিজরি)

(৯) কুমারী মেয়ের জানাযার নামায পড়ার বিধান

প্রশ্ন: কুমারী মুসলমান মেয়ের জানাযার নামায পড়ার বিধান কী?

উত্তর: এটি বৈধ বরং অন্যান্য মৃত মুসলমানদের ন্যায় এটিও ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি জানাযার খবর পেলেন তাঁদের মধ্য থেকে কিছু লোক আদায় করে নিলে অন্যদের পক্ষ থেকে এই ফরয পালন হয়ে যাবে। যদি জানাযার খবর পাওয়ার পরেও কেউ আদায় না করে তবে যারা জানতে পেরেছিল তারা সবাই গুনাহগার হবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৮২৫; মাদানী মুযাকারা, ১ রবিউস সানি ১৪৪২ হিজরি)

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতি ফুযাইল রেযা আত্তারী

(১) দোয়ার সময় উভয় হাত মেলানো সঠিক নাকি আলাদা রাখা?

প্রশ্ন: দ্বীনের আলেম এবং উজ্জ্বল শরীয়তের মুফতি সাহেবগণ এই বিষয় সম্পর্কে কী বলেন যে, দোয়া করার সময় উভয় হাত মেলা অবস্থায় থাকা উচিত নাকি সেগুলোর মধ্যে দূরত্ব থাকা উচিত? সঠিক পদ্ধতি কোনটি? দয়া করে পথনির্দেশ প্রদান করুন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: দোয়া করার সময় উভয় হাত মেলা অবস্থায় থাকা অথবা সেগুলোর মধ্যে দূরত্ব থাকা, উভয় পদ্ধতিই সঠিক। তবে উভয় হাতের মধ্যে কিছুটা হলেও দূরত্ব রাখা উত্তম।

وَاللّٰہُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَم صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) দান-সদকা ছাড়া অন্যান্য আমলের সওয়াব পৌঁছানোর (ঈছালে সওয়াব) বিধান?

প্রশ্ন: সম্মানিত আলেমগণ এই বিষয় সম্পর্কে কী বলেন যে, দান-সদকা ছাড়া কি অন্যান্য নেক কাজের সওয়াবও পৌঁছানো যেতে পারে?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: সকল প্রকার নেক আমল, চাই তা শারীরিক ইবাদত হোক যেমন নামায, রোজা ও কুরআন পাঠ; অথবা আর্থিক ইবাদত হোক যেমন যাকাত ও ফিতরা ইত্যাদি। এই সবকিছুর সওয়াব জীবিত অথবা মৃত যেকোনো মুসলমানকে পৌঁছানো বৈধ এবং প্রশংসনীয়।

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত:

اِنَّهٗ سَاَلَ رَسُوۡلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

يَارَسُوۡلَ اللهِ اِذَا نَتَصَدَّقُ عَنۡ مَوۡتَانَا وَنَحُجُّ عَنۡهُمۡ نَدۡعُو

مَامِنْ مُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ يَّقْرَأُ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ وَيَجْعَلُ ثَوَابَهَا لِاَهْلِ الْقُبُوْرِ اِلَّا لَمْ يَبْقَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ قَبْرٌ اِلَّا اَدْخَلَ اللّٰهُ فِيْهِ نُوْرًا فَوَسَّعَ قَبْرَهٗ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَكُتِبَ لِلْقَارِئِ ثَوَابُ سَبْعِيْنَ شَهِيْدًا

অর্থাৎ যে কোনো মুমিন নর-নারী আয়াতুল কুরসি পাঠ করে এবং তার সাওয়াব কবরবাসীদের উপহার দেয়, তবে পৃথিবীর বুকে এমন কোনো কবর থাকে না যাতে আল্লাহ তায়ালা নূর প্রবেশ না করান; আল্লাহ তার কবরকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেন এবং পাঠকারীর জন্য সত্তরজন শহীদের সওয়াব লিখে দেন।

(আল-কিরাআত ইন্দাল কুবূর লি-আবি বকর খাল্লাল, পৃষ্ঠা: ৩৫)

বাহারে শরীয়ত-এ রয়েছে: "রইল সাওয়াব পৌঁছানোর কথা যে, যা কিছু ইবাদত করা হলো তার সওয়াব অমুককে পৌঁছাবে, এতে কোনো ইবাদতের নির্দিষ্টতা নেই। প্রতিটি ইবাদতের সওয়াব অন্যকে পৌঁছানো যেতে পারে। নামায, রোজা, যাকাত, সদকা, হজ, কুরআন পাঠ, যিকির, কবর যিয়ারত ফরজ ও নফল সবকিছুর সওয়াব জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছানো যেতে পারে।" (বাহারে শরীয়ত, ১/১২০১)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যদের তিন দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশের জন্য বসা কেমন?

প্রশ্ন: দ্বীনের আলেম এবং উজ্জ্বল শরীয়তের মুফতি সাহেবগণ এই বিষয় সম্পর্কে কী বলেন যে, মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করার পর সাধারণত

لَهُمْ فَهَلْ يَصِلُ ذٰلِكَ اِلَيْهِمْ؟ قَالَ نَعَمْ وَيَفْرَحُوْنَ بِهٖ كَمَا يَفْرَحُ اَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ اِذَا اُهْدِيَ اِلَيْهِ۔

অর্থাৎ তিনি আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন আমরা আমাদের মৃতদের পক্ষ থেকে সদকা করি, তাঁদের পক্ষ থেকে হজ করি এবং তাঁদের জন্য দোয়া করি, তবে কি তা তাঁদের নিকট পৌঁছায়? তখন তিনি ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! তাঁরা এতে ঠিক তেমনি আনন্দিত হন যেমন তোমাদের কেউ সেই সময় আনন্দিত হও যখন তাকে খাবারের থালা উপহার পাঠানো হয়।" (উমদাতুল ক্বারী, ৩/১৭৭)

হযরত আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর স্বীয় পিতা থেকে এবং তিনি স্বীয় পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا كُتِبَ لَهٗ عِتْقًا مِنَ النَّارِ وَكَانَ لِلْمَحْجُوْجِ عَنْهُمَا اَجْرُ حَجَّةٍ تَامَّةٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمَا شَيْئًا

অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের পক্ষ থেকে হজ করবে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হয় এবং যাঁদের পক্ষ থেকে হজ করা হয়েছে তাঁদের জন্য কোনো সাওয়াব হ্রাস না করেই একটি পূর্ণ হজের সাওয়াব প্রদান করা হয়।"

(শুআবুল ঈমান, ৬/২০৫)

হযরত আলী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত:

আমাদের এখানে তিন দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশের জন্য বসার প্রথা রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা তাঁদের বাড়ির পাশে অথবা কোনো উপযুক্ত স্থানে বসেন এবং অন্যান্য মুসলমানগণ তাঁদের সাথে শোক প্রকাশ করতে আসেন। তবে এভাবে তিন দিন বসার শরয়ী বিধান কী? এছাড়া যদি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ তিন দিনের আগেই এই ধারা শেষ করতে চান, তবে তা করতে পারবেন কি না?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: কোনো মুসলমানের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করা এবং তাঁদের ধৈর্য ও সাহসের প্রেরণা দেওয়া সুন্নাত এবং অনেক বড় সওয়াবের কাজ। আর মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের বাড়ি অথবা কোনো উপযুক্ত স্থানে তিন দিন পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে বসা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও মুবাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত এতে কোনো নিষিদ্ধ কাজ (যেমন গলি বা রাস্তা বন্ধ করে সেখানে বসা যাতে পথচারীদের কষ্ট হয়, অথবা এই উপলক্ষে দামী গালিচা ও চাদর বিছানো, বিভিন্ন প্রকারের খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য লোক দেখানো বা প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করা, তদ্রূপ মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় সীমা অতিক্রম করা এবং সমবেদনার সময় এমন কথা বলা যা দুঃখ ও বেদনাকে বাড়িয়ে দেয় ইত্যাদি) করা না হয়। তবে এভাবে বসা কোনো আবশ্যক বিষয় নয় বরং ফকীহগণের বর্ণনা অনুযায়ী এটি বর্জন করা (অর্থাৎ শোক প্রকাশের জন্য আলাদাভাবে না বসা) উৎকৃষ্ট ও উত্তম। অতএব তিন দিনের আগে এই ধারা শেষ করতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই।

وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ব্যবসার আহকাম

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) বাকিতে বিক্রি করা পণ্যের টাকা সময়ের আগে দাবি করা কেমন?

প্রশ্ন: এই মাসআলা সম্পর্কে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম কী বলেন যে, আমি আমার এক বন্ধুর নিকট ছয় মাসের বাকিতে কিছু পণ্য বিক্রি করেছিলাম, কিন্তু মাত্র চার মাস অতিবাহিত হয়েছে এবং আমার টাকার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তবে কি আমি তার থেকে ধারের টাকা এখনই দাবি করতে পারি?

উত্তর: প্রশ্নোক্ত অবস্থায় আপনি যখন মূল্য পরিশোধের জন্য আপনার বন্ধুকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অর্থাৎ ছয় মাসের অবকাশ দিয়েছেন এবং তিনিও এই মেয়াদ গ্রহণ করে নিয়েছেন, তখন এই ঋণ (পরিশোধযোগ্য অর্থ) 'মেয়াদী' হয়ে গেছে। এখন এই মেয়াদপূর্ণ হওয়ার আগে আপনি আপনার ধারের টাকা দাবি করতে পারেন না। কারণ ফকীহগণের বর্ণনা অনুযায়ী, যখন কোনো ঋণের জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়, তখন সেই মেয়াদ আবশ্যক হয়ে যায়। এরপর ঋণদাতার এই অধিকার থাকে না যে, নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে ঋণ পরিশোধের দাবি করে। কারণ এই অবকাশ ঋণগ্রহীতার অধিকারে পরিণত হয়েছে এবং ঋণগ্রহীতার অধিকার অন্য কেউ বাতিল করতে পারে না। তবে অপর পক্ষ যদি রাজি থাকে, তবে তিনি টাকা আগে দিয়ে দিতে পারেন।

বাহারে শরীয়ত-এ রয়েছে: "বিক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির পর ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য অবকাশ দেয় অর্থাৎ তার জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয় এবং ক্রেতাও তা গ্রহণ করে নেয়, তবে এই ঋণ মেয়াদী হয়ে গেল; অর্থাৎ বিক্রেতার ওপর সেই মেয়াদ আবশ্যক হয়ে গেল, সে তার আগে দাবি করতে পারবে না। প্রতিটি ঋণের একই বিধান যে, মেয়াদী ছিল না কিন্তু পরে মেয়াদ নির্ধারিত হয়ে গেলে তা মেয়াদী হয়ে যায়, তবে ঋণগ্রহীতার গ্রহণ করা শর্ত। যদি সে অস্বীকার করে তবে মেয়াদী হবে না, তখনই তা পরিশোধ

করা ওয়াজিব হবে এবং পাওনাদার যখন চাইবে দাবি করতে পারবে।” (বাহারে শরীয়ত, ২/৭৫২)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) কোটেশন পাস করানোর জন্য ম্যানেজারকে কমিশন দেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: এই মাসআলা সম্পর্কে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম কী বলেন যে, আমি এসি ডাক্ট সার্ভিসের কাজ করি। কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা কাজ করাতে চায় এবং তারা আমাদের কাছে কোটেশন চায়, যাতে সার্ভিস চার্জ ও পূর্ণ বিবরণ থাকে যে, আমরা এই কাজ কত টাকায় করে দেব। আমার মতো আরও অনেকে কোটেশন দেয়। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজাররা বলেন যে, আমরা আপনার কোটেশন অনুমোদন করে দেব, কিন্তু কাজ করার পর প্রতিষ্ঠান আপনাকে কাজের যে টাকা দেবে সেখান থেকে আমরা কমিশন নেব। যদি আমরা কমিশন দিতে রাজি না হই, তবে তিনি অন্য কারো কোটেশন অনুমোদন করে দেবেন। তবে কি আমরা কোটেশন অনুমোদন করানোর জন্য এই শর্ত মানতে পারি কি না? এবং এই শর্তে আমরা কাজ নিয়ে ম্যানেজারকে কমিশন দিতে পারি কি না?

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনার কোটেশন পাস করানোর জন্য ম্যানেজারকে টাকা দেওয়া এবং ম্যানেজারের এই টাকা নেওয়া ঘুষ। এর কারণ হলো; নিজের কাজ হাসিল করার জন্য কাউকে টাকা দেওয়া ঘুষ হিসেবে গণ্য হয়। একইভাবে যে কাজ নিজের পদমর্যাদার কারণে আগে থেকেই করা আবশ্যক, সেই কাজের জন্য টাকা নেওয়াও ঘুষের অন্তর্ভুক্ত এবং ঘুষের আদান-প্রদান নাজায়েয ও হারাম। সুতরাং এটি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

তিরমিযী শরীফ-এ রয়েছে:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘুষদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। (তিরমিযী, ৩/৬১৪)

শামী-তে রয়েছে: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له او يحمله على ما يريد "ঘুষ হলো তা যা কোনো ব্যক্তি বিচারক বা অন্য কাউকে এই উদ্দেশ্যে দেয় যেন সে তার পক্ষে রায় দেয় অথবা তাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত করে।” (রদ্দুল মুহতার, ৮/৩৪)

ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: “ঘুষ নেওয়া সাধারণভাবে হারাম, কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। যা অন্যের অধিকার খর্ব করার জন্য দেওয়া হয় তা ঘুষ। তদ্রূপ নিজের কাজ হাসিল করার জন্য শাসক বা কর্মকর্তাদের যা দেওয়া হয় তা ঘুষ।” (ফাতাওয়ায়ে রযভীয়্যাহ, ২৩/৫৯৭)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) মোটর থেকে নির্গত তামা (কপার) নিজে রেখে দেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: এই মাসআলা সম্পর্কে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম কী বলেন যে, আমার মোটর ওয়াইন্ডিংয়ের কাজ। তামা দিয়ে তৈরি মোটর যখন পুড়ে যায় এবং আমার কাছে মেরামতের জন্য আসে, তখন সেখান থেকে যে পুরাতন তামা বের হয় তা অধিক মূল্যের হয়ে থাকে, যেমন ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা।

তখন আমি গ্রাহককে জানিয়ে দিই যে এতটুকু তামা বের হয়েছে যার মূল্য এত এবং এরপর সেই টাকা মোটর তৈরির মজুরির সাথে সমন্বয় করে নিই। কিন্তু যখন সিলভার দিয়ে তৈরি কোনো মোটর মেরামতের জন্য আমার কাছে আসে, তখন সেখান থেকে খুব সামান্য মূল্যের অর্থাৎ ১০০ বা ১৫০ টাকার সিলভার বের হয়। তখন আমি সেই সিলভার নিজের কাছে ভাঙ্গারি হিসেবে রেখে দিই এবং গ্রাহককে সেই সিলভার দিই না আর মজুরির সাথেও তার দাম সমন্বয় করি না। এখন প্রশ্ন হলো; আমার এভাবে সিলভার গ্রাহককে না জানিয়ে নিজের কাছে রাখা কি সঠিক?

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনার জন্য মোটর থেকে নির্গত পুরাতন সিলভার নিজে রেখে দেওয়া জায়েয নয়।

এর কারণ হলো; উল্লিখিত কাজে আপনার অবস্থান 'সাধারণ কর্মচারী' (আজিরে মুশতারাক) হিসেবে এবং সাধারণ কর্মচারীর কাছে মানুষের জিনিসপত্র 'আমানত' থাকে। সুতরাং মোটর ওয়াইন্ডিংয়ের সময় মোটর থেকে নির্গত পুরাতন সিলভার তার মূল্য ১০০-১৫০ টাকা হোক বা তার বেশি; তা মোটরের মালিকেরই সম্পদ এবং আপনার কাছে আমানত। অতএব আপনার ওপর আবশ্যক হলো যে, মোটর থেকে যতটুকু সিলভার বের হবে তা তার মালিকের নিকট সোপর্দ করা। অথবা এটিও সম্ভব যে, সেই সিলভারের সমপরিমাণ অর্থ মালিককে দিয়ে দেওয়া। মালিকের অনুমতি ছাড়া এই সিলভার নিজের ব্যবহারে আনা অথবা নিজের কাছে রেখে পরে বিক্রি করে দেওয়া গুনাহ এবং অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার শামিল। মালিকের স্পষ্ট বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেওয়া অনুমতি ছাড়া এটি ব্যবহার করা যাবে না।

রদ্দুল মুহতার-এ রয়েছে: "কোনো মুসলমানের জন্য অন্য কারো সম্পদ শরয়ী কারণ ছাড়া গ্রহণ করা জায়েয নয়।"

(রদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুররুল মুখতার, ৪/৬১)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত সায়্যিদুনা আওফ বিন মালিক আশজায়ী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

হযরত সায়্যিদুনা আওফ বিন মালিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا এর গণনা প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সেই সকল উৎসর্গিত ব্যক্তিদের মধ্যে হয় যারা কেবল বীরত্বের দিক থেকেই সাহসী ও ব্যূহভেদকারী ছিলেন না বরং জ্ঞান ও মর্যাদার দিক থেকেও হেদায়েতের আকাশের অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি ৫ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। তাঁর সম্পর্ক ছিল আরবের বিখ্যাত গোত্র 'বনু আশজা'র সাথে। তাঁর উপনাম ছিল আবু আব্দুর রহমান অথবা আবু হাম্মাদ। তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মালিক বিন আবু আওফ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ও সাহাবিত্বের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি একজন অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। খয়বর যুদ্ধে শত্রুদের নাস্তানাবুদ করেছিলেন, আর মুতা যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে মস্তক হাতের তালুতে রেখে শত্রুদের ব্যূহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেই বারো হাজার পুণ্যবান ব্যক্তিদের অংশ ছিলেন যাঁদের মহিমা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। সেই সময় বনু আশজা গোত্রের পতাকা তাঁর হাতে ছিল। তিনি সিরিয়া বিজয়ের সময়ও বীরত্ব ও সাহসিকতার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। (তবাকাত ইবনে সাদ, ৪/২১১)

দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলের দরবারে উপস্থিত থাকতেন, মুস্তফার صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মার্জিত কথাগুলো শুনতেন এবং নববী ফয়যে নিজেকে ধন্য করতেন। এভাবে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা করতেন। সুতরাং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে: তিনি রাসূলের দরবারে আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! এই শব্দগুলো সম্পর্কে আপনার

মতামত কী? সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: তোমার শব্দগুলো আমাকে শোনাও। সেগুলোতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে শিরক না থাকে। (মুসলিম, ৯৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৩২)

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: নাজায়েয বা শিরকী কথা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হারাম অথবা কুফরি; বৈধ দোয়া পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করা সুন্নাত। যে ঝাড়-ফুঁকের অর্থ জানা নেই, তা পড়া উচিত নয়। (মীরাতুল মানাজীহ, ৬/২১৩)

হযরত আওফ বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا এর প্রকৃতিতে রসবোধও ছিল। সুতরাং তাবুক যুদ্ধের সময় যখন রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চামড়ার তৈরি একটি ছোট তাবুতে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর আরজ করলেন: আমি কি পুরো শরীর নিয়েই ভেতরে আসব? ইরশাদ হলো: পুরোপুরি ভেতরে চলে আসো। (ইবনে মাজাহ, ৪/৩৮০, হাদীস: ৪০৪২)

পবিত্র কুরআনে একটি মোবারক আয়াত রয়েছে:

وَ مَنۡ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجۡعَلۡ لَّهٗ مَخۡرَجًا ۙ﴿۲﴾
وَّ یَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُ ؕ

কানযুল ইরফানের অনুবাদ: এবং যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন। (পারা: ২৮, আত-তালাক: ২, ৩)

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো: হযরত আওফ বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا -এর পুত্রকে মুশরিকরা বন্দী করে ফেলেছিল। তখন তিনি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: মুশরিকরা আমার ছেলেকে বন্দী করে রেখেছে; সাথে সাথে তিনি নিজের অভাব ও দারিদ্র্যের অভিযোগও পেশ করলেন। সায়্যিদে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধরো এবং বেশি বেশি

"لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡم"

পাঠ করতে থাকো। হযরত সায়্যিদুনা আওফ বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا ঘরে ফিরে এসে স্বীয় স্ত্রীকে এই কথা জানালেন এবং দুজনেই তা পাঠ করা শুরু করলেন। তাঁরা পাঠ করছিলেন এমন সময় ছেলে দরজায় কড়া নাড়ল। ভেতরে প্রবেশ করে ছেলে জানাল যে, শত্রুরা অসতর্ক হয়ে পড়েছিল, সে সুযোগ বুঝে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে এবং আসার সময় শত্রুদের চার হাজার ভেড়াও সাথে নিয়ে এসেছে। হযরত আওফ বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন: এই ভেড়াগুলো কি তাঁর জন্য হালাল? হুজুর আনোয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুমতি দিলেন এবং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, ১০৩৩ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

একবার হযরত আওফ বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাঁকে গালিগালাজ করতে শুরু করল। কিন্তু তিনি ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকে কোনো উত্তর দিলেন না এবং মাটিতে শুয়ে পড়লেন। সেই সময় তাঁর মাথায় একটি টুপি ছিল, তিনি টুপিটি নিজের চেহারার ওপর টেনে দিলেন এবং চোখ বন্ধ করে নিলেন। সেই ব্যক্তি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গালি দিল,

কিন্তু যখন তাঁর পক্ষ থেকে কোনো জবাব পেল না, তখন নিরাশ হয়ে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল: আল্লাহ আপনার ক্ষমা করুন! অবাক করার বিষয় যে, এক ব্যক্তি আপনাকে গালি দিচ্ছিল আর আপনি আরাম করছিলেন? তিনি বললেন: আমি তো শুধু এটি দেখেছিলাম যে, আমার কাছে শয়তান এসেছে, তাই নীরবতা অবলম্বন করেছি। আর যখন সে আমার থেকে কোনো জবাব পেল না, তখন সে পালিয়ে গেল। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৭/৫২)

আন্তর্জাতিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তারী কাদেরী বলেন: যখন কেউ আমাদের সাথে বিবাদে জড়ায় অথবা মন্দ কথা বলে, সেই সময় নীরবতা পালন করাই আমাদের জন্য কল্যাণকর; যদিও শয়তান লক্ষ কুমন্ত্রণা দেয় যে, তুমিও তাকে জবাব দাও নতুবা মানুষ তোমাকে ভীরু বলবে; ওহে ভাই! এটি ভদ্রতার যুগ নয়, এভাবে চললে মানুষ তো তোমাকে বাঁচতেই দেবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে একটি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করছি যা পাঠ করলে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, অন্যের কটু কথায় নীরব থাকা ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের কতটা নিকটে থাকে। সুতরাং আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ -কে মন্দ বলছিল। যখন সে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করল, তখন তিনি তার কিছু কথার জবাব দিলেন (যদিও তাঁর জবাব পাপাচার মুক্ত ছিল, তবুও) মহান নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখান থেকে উঠে গেলেন। সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হুজুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে গিয়ে আরজ করলেন: ইয়া রসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে আমাকে মন্দ বলছিল আর আপনি উপস্থিত ছিলেন, যখন আমি তার কথার জবাব দিলাম তখন আপনি উঠে গেলেন! তিনি ইরশাদ করলেন: তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিল যে তার জবাব দিচ্ছিল, এরপর যখন তুমি নিজে জবাব দিতে শুরু করলে, তখন শয়তান মাঝখানে চলে আসল। (আবু দাউদ, ৪/৩৫৯, ৩৫৮, হাদীস: ৪৮৩৭, ৪৮৩৬; রাগের চিকিৎসা, ১৯ পৃষ্ঠা)

একবার হযরত আওফ বিন মালিক আশজায়ী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا মসজিদে পা ছড়িয়ে একটি মজলিসে বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর ছাত্র হযরত কাসীর বিন মুররাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আসলেন। তাঁকে দেখে তিনি পা গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন: আমি পা এই জন্যই ছড়িয়ে রেখেছিলাম যাতে কোনো নেক লোক আসলে আমি তাঁকে আমার কাছে বসাতে পারি।

(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা:২৯৪, নম্বর: ১১৪৭)

তিনি যেখানেই সুযোগ পেতেন মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতেন এবং বিদ্যার আলো ছড়িয়ে দিতেন। সুতরাং দামেস্কের বাইরে গ্রামে তাঁর একজন বন্ধু বাস করতেন; যখনই তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন, তখন লোকজন তাঁর চারধারে জমা হয়ে যেত এবং দ্বীনি মাসআলা জিজ্ঞেস করত আর তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাদের জবাব দিতেন।

(তাবারানীর মুসনাদুশ শামিয়্যীন, ৪/১১৫, নম্বর: ২৮৭২)

তিনি আল্লাহর ভয়ের প্রবলতা এবং পরকালীন জবাবদিহিতার কথা চিন্তা করে এই ইচ্ছা প্রকাশ করতেন যে, হায়! আমি যদি কোনো বাড়িতে একটি ভেড়া হতাম যাকে বাড়ির লোকেরা জবাই করত, অতঃপর আমাকে ঝলসে দিত এবং আমার গোশত খেয়ে নিত।

(মওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ২/৫৬৫, নম্বর: ১৫৯)

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খিলাফতের যুগে তিনি সিরিয়া দেশে চলে যান এবং হিমসে বসবাস শুরু করেন। এখানেই ৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করে মহান প্রতিপালকের সান্নিধ্যে চলে যান। হযরত সায়্যিদুনা আওফ বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর গণনা শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে হয়। তাঁর বর্ণিত ৬৭টি হাদীসের উজ্জ্বল ও মূল্যবান মুক্তো হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। (তবাকাত ইবনে সাদ, ৪/২১১; নববীর তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ২/৩৫৪)

একটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন; হযরত আওফ বিন মালিক আশজায়ী বর্ণনা করেন যে, নবী আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: তোমাদের শ্রেষ্ঠ ইমাম (খলিফা) তাঁরাই যাঁদের তোমরা ভালোবাসবে এবং তাঁরা তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমরা তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে এবং তাঁরা তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবেন। আর তোমাদের নিকৃষ্ট ইমাম (শাসক) তাঁরাই যাঁদের তোমরা ঘৃণা করবে এবং তাঁরা তোমাদের ঘৃণা করবেন, তোমরা তাঁদের লানত করবে এবং তাঁরা তোমাদের লানত করবে।

(মুসলিম, ৭৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮০৪)

হযরত সায়্যিদুনা আওফ বিন মালিক আশজায়ী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা এবং হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا -এর মতো উচ্চমর্যাদাশীল সাহাবীগণ রয়েছেন; অপরদিকে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী এবং হযরত আবু ইদ্রিস খাওলানী-র মতো তাবেয়ীগণও রয়েছেন যাঁদের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীরতা সবাই স্বীকার করেছেন।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ২৭/৪৪)

আল্লাহ পাক তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বুযুর্গানে দ্বীনের দৃষ্টিতে

বড়পীরের সোনালী বাণীসমূহ

মাওলানা বিলাল হুসাইন আত্তারী মাদানী

তাসাউফ ও তরীকতের ক্ষেত্রে বড়পীর, সায়্যিদুনা শেখ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মর্যাদা একটি সূর্যের ন্যায়, যার জ্যোতি আজও হৃদয়সমূহকে আলোকিত করছে। “মহিউদ্দীন”, “মাহবুবে সুবহানী” এবং “গাউসে আজম”-এর মতো উপাধিগুলো তাঁর সেই আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় যা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় জ্ঞানেই পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

আলোচ্য নিবন্ধে ওলীকুল শিরোমণি, হুজুর বড়পীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কিছু নির্বাচিত বাণী পেশ করা হচ্ছে, যা দুনিয়ার বাস্তবতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি, অভ্যন্তরীণ সংশোধন, সত্যবাদিতা, খোদাভীতি এবং একনিষ্ঠতার মতো মৌলিক বিষয়গুলোকে বেষ্টন করে আছে। আসুন! এই সোনালী উপদেশগুলোর আলোতে নিজেদের নফসের হিসাব গ্রহণ করি:

(১) দুনিয়া এবং পরীক্ষা

হে লোকসকল! ধৈর্যধারণ করো, পার্থিব জীবন আপদ এবং মুসিবতে পরিপূর্ণ। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই এ থেকে রক্ষা পায়। দুনিয়ার এমন কোনো নেয়ামত নেই যার সাথে মুসিবত ও দুঃখ নেই; এমন কোনো আনন্দ নেই যার সাথে বেদনা নেই এবং এমন কোনো স্বচ্ছলতা নেই যার সাথে সংকীর্ণতা নেই। শরীয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে দুনিয়া থেকে নিজেদের ভাগ্যের অংশগ্রহণ করতে থাকো। নিশ্চিত কথা এই যে, দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন থেকে যে ব্যাধি সৃষ্টি হয়, শরীয়তই তার একমাত্র চিকিৎসা।

(ফাতহুল রব্বানী, সপ্তম মজলিস, পৃষ্ঠা: ৪০)

এই বাণীতে হুজুর বড়পীর দুনিয়ার বাস্তবতা উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, এখানে কোনো নেয়ামতই বিপদ মুক্ত নয়। সাথে সাথে এর চিকিৎসাও প্রদান করেছেন যে, মানুষ যেন শরীয়তের সীমানায় থেকে নিজের তকদীরের অংশ তালাশ করে; কারণ দুনিয়ার ভালোবাসা

থেকে সৃষ্ট অন্তরের ব্যাধিসমূহের একমাত্র চিকিৎসা হলো পবিত্র শরীয়ত।

(২) আল্লাহর সন্তুষ্টি

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে না, তাকে সাহায্য করা হয় না এবং তাকে তৌফিকও দেওয়া হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট নয়, আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট নন। যে নিজে অন্যকে দেয় না, তাকেও দেওয়া হয় না। যে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে না, কেউ তার কাছেও আসবে না। (ফাতহুল রব্বানী, সপ্তম মজলিস, পৃষ্ঠা: ৪১)

এই বাণীটি একটি পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। আল্লাহর সাথে এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে মানুষের আচরণ যেমন হবে, সে তেমনি প্রতিদান পাবে। সন্তুষ্টি, দানশীলতা এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি, তৌফিক এবং মানুষের ভালোবাসা অর্জিত হয়।

(৩) অভ্যন্তরীণ সংশোধন

মুমিন ব্যক্তি প্রথমে নিজের বাতেনকে আবাদ করে, তারপর জাহেরকে। যেমন কোনো ব্যক্তি যখন ঘর নির্মাণ করে, তখন প্রথমে সেটির ভেতরের অংশে বড় অংকের অর্থ ব্যয় করে, অথচ তার দরজাটি অবিন্যস্তই থাকে। যখন ঘরের ভেতরের নির্মাণ সম্পন্ন হয়, তখন সে দরজা তৈরি করে। একইভাবে আধ্যাত্মিক পথের পথিক আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে পথচলা শুরু করবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করবে; অতঃপর তাঁর নির্দেশেই সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করবে।

(ফাতহুল রব্বানী, অষ্টম মজলিস, ৪৩ পৃষ্ঠা)

এই বাণীতে সালেককে জীবন নির্মাণের বিন্যাস শেখানো হয়েছে যে, প্রথমে অভ্যন্তরীণ আবাদকরণ, তারপর বাহ্যিক সৌন্দর্যবর্ধন। অর্থাৎ আগে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করবে এবং তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হবে, অতঃপর তাঁর নির্দেশেই সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হবে।

(৪) দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত

তোমাদের ওপর আক্ষেপ হয় যে, দুনিয়ার বিনিময়ে তোমরা কীভাবে আখেরাতকে নষ্ট করছ! নিজের নফস, প্রবৃত্তি, শয়তান এবং সৃষ্টির আনুগত্য করে নিজেদের মালিকের অনুগত্যকে কীভাবে কলুষিত করছ! আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে অভিযোগ ও অনুযোগ করে নিজেদের খোদাভীতিকে কেন নষ্ট করছ? তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহ তায়ালা পরহেজগারদের রক্ষক ও সাহায্যকারী? তিনি তাদের থেকে মন্দকে প্রতিহত করেন, তাদের জ্ঞানের সম্পদ দান করেন, তাদের নিজের মারেফাত দান করেন, তাদের কষ্টদায়ক বিষয় থেকে মুক্তি দান করেন এবং তাদের এমন স্থান থেকে রিজিক পৌঁছান যা তাদের ধারণার বাইরে।

(ফাতহুল রব্বানী, নবম মজলিস, পৃষ্ঠা: ৪৪)

এই বাণীতে মানুষের সেই মৌলিক ভুলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে নশ্বর দুনিয়ার লোভে চিরস্থায়ী আখেরাত ধ্বংস করে ফেলে। সাথে সাথে মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর বিশেষ সুরক্ষা, রিজিক, জ্ঞান এবং মুক্তির সুসংবাদ দিয়ে তাকওয়া অবলম্বনের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

(৫) অন্যকে উপদেশ কিন্তু নিজে বিপরীত

তোমার ওপর আক্ষেপ হয় যে, তুমি কুরআন মুখস্থ করো কিন্তু তার ওপর আমল করো না; আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর হাদীসসমূহ মুখস্থ করো কিন্তু সেগুলোর ওপর আমল করো না। তুমি এটি কী করছ? মানুষকে কাজ করার কথা বলো কিন্তু নিজে তা করো না! অন্যদের বাধা দাও অথচ নিজে তা থেকে বিরত থাকো না।

(ফাতহুল রব্বানী, দশম মজলিস, পৃষ্ঠা: ৪৫)

এই বাণীটি সেই মুনাফিকি আচরণের ওপর কঠোর আঘাত, যেখানে মানুষ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান তো রাখে এবং অন্যকে নেকির দাওয়াতও দেয়, কিন্তু নিজে তার ওপর আমল করে না। প্রকৃত সফলতা শুধু জ্ঞান অর্জন বা উপদেশ প্রদানে নয়, বরং সেই জ্ঞানের ওপর নিজে আমল করা এবং নিজের চরিত্র সংশোধনের মধ্যে নিহিত। আমলহীন জ্ঞান কেবল বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

(৬) মুত্তাকী এবং মুনাফিকের আমল

মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করেন; কারণ ইবাদত তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তিনি নিজের জাহের এবং বাতেন উভয় দিক দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর দাসত্ব করেন। অপরদিকে মুনাফিক প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা করে; বিশেষ করে সে বাহ্যিকভাবে কৃত্রিমতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে সে ইবাদত বর্জনকারী। (ফাতহুল রব্বানী, দশম মজলিস, পৃষ্ঠা: ৪৫)

এই মোবারক বাণীতে লৌকিকতা এবং ইখলাসের মধ্যকার পার্থক্যের সীমারেখা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুত্তাকীর ইবাদত তাঁর মজ্জাগত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাই তিনি কৃত্রিমতা ছাড়াই ইবাদত করেন। আর মুনাফিকের ইবাদত কেবল বাহ্যিক প্রদর্শনী মাত্র এবং অন্তরে সে এ থেকে শূন্য থাকে।

(৭) সত্য বলো, সফল হও

হে আল্লাহর বান্দারা! সত্য বলো এবং সফল হও। সত্যবাদীর সাহস আকাশচুম্বী; কারো কথা তাকে ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ স্বীয় কাজে প্রবল; তিনি যখন তোমার থেকে কোনো কাজ নেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন তোমাকে তার জন্য প্রস্তুত করে দেবেন।

(ফাতহুল রব্বানী, ঊনষাটতম মজলিস, পৃষ্ঠা: ১৯৬)

এই বাণীতে সত্যবাদিতাকে সফলতার গ্যারান্টি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সত্যবাদী মানুষের সাহস এত উন্নত হয় যে, মানুষের কথাবার্তা তাকে বিচলিত করতে পারে না; কারণ সে আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা রাখে। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্যবাদী বান্দাকে প্রতিটি কাজের জন্য নিজেই প্রস্তুত করে দেন।

(৮) প্রকৃত আলেম এবং দুনিয়াত্যাগী কে?

যদি তোমার নিকট জ্ঞানের ফল ও বরকত থাকত, তবে নিজের নফসের প্রবৃত্তি ও স্বাদের জন্য সম্রাটদের দ্বারে দ্বারে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে না। প্রকৃত আলেমের সেই পা-ই নেই যা দিয়ে সে সৃষ্টির দ্বারে দৌড়াবে, আর দুনিয়াত্যাগীর সেই দুটি হাতই নেই যা দিয়ে সে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করবে। (ফাতহুল রব্বানী, ঊনষাটতম মজলিস, পৃষ্ঠা: ১৯৬)

এই বাণীতে হুজুর বড়পীর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রকৃত আলেম এবং যাহিদের পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃত আলেম তিনি যিনি দুনিয়াদারদের দরজায় ভিড় করেন না এবং প্রকৃত যাহিদ তিনি যিনি মানুষের সম্পদের ওপর নজর রাখেন না।

(৯) অহেতুক বিষয় বর্জন

যার ইসলাম সঠিক এবং দৃঢ় হয়, সে উপকারী বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয় এবং নিরর্থক বিষয় থেকে বিমুখ হয়। অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া বেকার এবং রোগীদের কাজ। সে নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত যে তাঁর নির্দেশের ওপর আমল করে না এবং সেই কাজ করে যা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। এটিই আসল বঞ্চনা, আসল মৃত্যু এবং সব ধরনের ক্ষতি। দুনিয়াতে তোমার লিপ্ত হওয়ার জন্য নেক নিয়ত প্রয়োজন, অন্যথায় তুমি আল্লাহর গজবের শিকার হবে। (ফাতহুল রব্বানী, ষাটতম মজলিস, পৃষ্ঠা: ২০১)

এই মোবারক বাণীতে ঈমানের সুস্থতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরিপূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ মুসলমান তিনিই যিনি ফলহীন ও অসার কাজ বর্জন করে আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করেন। আরও বলা হয়েছে যে, মানুষের দুনিয়াবী কাজগুলোও যদি নেক নিয়ত শূন্য হয়, তবে তা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গজবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পীরানে পীর, সায়্যিদুনা বড়পীর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এই উপদেশগুলোর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আপন বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন

মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

রবিউস সানি ইসলামী বর্ষপঞ্জির চতুর্থ মাস। এই মাসে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ মহান আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ এবং ইসলামের প্রাজ্ঞ আলেমগণ ওফাত লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে ১১৭ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "মাসিক ফয়যানে মদীনা"-র রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি থেকে ১৪৪৭ হিজরি পর্যন্ত সংখ্যাগুলোতে করা হয়েছে। আরও ১১ জন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও আলেমগণের পরিচিতি নিচে তুলে ধরা হলো:

আউলিয়া ও মাশায়েখ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ:

(১) মীরান সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক কাদরী বাগদাদী বিজাপুরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ 'এর জন্ম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর বংশধারায় ইরাকের বাগদাদে হয়েছিল এবং ২২শে রবিউস সানি ১০৫১ হিজরিতে ভারতের কর্নাটকের বিজাপুরে ওফাত লাভ করেন। তাঁর মাজার "জোড় গম্বুজ" নামে বিখ্যাত। তিনি সমসাময়ীক কুতুব ও অনন্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং কাদরীয়া তরিকতের বিশিষ্ট মাশায়েখদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তাযকিরাতুল আনসাব, পৃষ্ঠা: ১০৮)

(২) হযরত শাহ সৈয়দ নূরুল উলা নকশবন্দী আবুল উলাই رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ: তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম, সততা ও নির্মলতার প্রতীক, বিপুল ফয়যের অধিকারী এবং স্বীয় সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবুল উলা আহরারী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর সাজ্জাদানশীন ছিলেন। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর সম্মানিত পিতা শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী তাঁর নিকট থেকেই খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর ওফাত ৭ই রবিউস সানি ১০৯০ হিজরিতে হয়েছিল। ভারতের আগ্রা শহরে স্বীয় সম্মানিত পিতার পদতলে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

(আগ্রার ২৮৩ জন আউলিয়ায়ে কেরামের সীরাত, পৃষ্ঠা: ১৮৩)

(৩) রাশিদী (পীর পাগারা) বংশের আদিপুরুষ হযরত মিয়াঁ পীর সাঁই সৈয়দ মুহাম্মদ বাকা শাহ শহীদ পট্টধনী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ: তাঁর জন্ম ১১৩৫ হিজরিতে সিন্ধু প্রদেশের খায়েরপুর মীরস জেলার রাসুল ছোট সাইদি-র এক হুসাইনী সৈয়দ পরিবারে হয়েছিল এবং ৯ই রবিউস সানি ১১৯৮ হিজরিতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মাজার সিন্ধুর খায়েরপুর মীরস জেলার শেখ তৈয়ব নামক

জনপদে অবস্থিত। তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জ্ঞানের ধারক, পীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (চন্নাহ শরীফ, ঝং জেলা)-এর মুরিদ ও খলিফা এবং মাখদুম ইসমাইল রোহড়ি চিশতী নকশবন্দী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর ফয়েযপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সিন্ধি ভাষার একজন উচ্চমাপের কবি, তরীকতের শায়খ এবং সঠিক পথের দিশারী ছিলেন। (তাযকিরায়ে আউলিয়ায়ে সিন্ধু, পৃষ্ঠা: ৩৬০-৩৬১)

(৪) হযরত আল্লামা গুল পীর কাদরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ: তিনি পীর মুহাম্মদ কাসিম আঙ্গভী কাদরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর প্রপৌত্র এবং পীর চেরাগ আলী আঙ্গভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সন্তান ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র 'আস্তানা-এ-কাদরীয়া কাসেমীয়া ঢোড্ডা শরীফ'-এর প্রতিষ্ঠাতা, কঠোর সাধক, কসীদা-এ-গাওসিয়ার আমলকারী এবং কারামতের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্ম খুশাব জেলার উয়াদী সোন সেকাইসারের আঙ্গাহ শরীফে হয়েছিল এবং ১০ই রবিউস সানি ১৩৩১ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন। তাঁর মাজার গুজরাট জেলার ঢোড্ডা শরীফে অবস্থিত। (খুশাব সরজমিনে আউলিয়া, ৬২-৬৫ পৃষ্ঠা)

(৫) জামালে মিল্লাত হযরত মাওলানা পীর সৈয়দ জামালুদ্দীন শাহ কাযেমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ: তাঁর জন্ম মিয়ানওয়ালী জেলার খানকাহ খাজা আবাদ-এ হয়েছিল এবং ৫ই রবিউস সানি ১৪২০ হিজরিতে সেখানেই ওফাত লাভ করেন। তিনি আল্লামা আতা মুহাম্মদ বান্দিয়ালভীর ছাত্র, করাচীর দারুল উলুম আমজাদিয়া ও জামিয়া শামসিয়া নাসেরিয়া খাজা আবাদ-এর স্নাতক ছিলেন। তিনি স্বীয় সম্মানিত পিতা খাজা পীর সৈয়দ কামালুদ্দীন শাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুরিদ ও খলিফা, করাচীর জামিয়া কামরুল উলুম ফরিদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং আহলে সুন্নাতের একজন সক্রিয় পথপ্রদর্শক ছিলেন।

(তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত মিয়ানওয়ালী, পৃষ্ঠা: ২০৫-২০৬)

(৬) পীরে তরীকত সূফী ইকবাল আহমদ নূরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ: তাঁর জন্ম ১৩৪০ হিজরিতে ভারতের বেরেলী শরীফের কেল্লা সংলগ্ন ইকবাল চকের সূফী আজীজ আহমদ হামেদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর গৃহে হয়েছিল। তিনি বেরেলীর দারুল উলুম মানজারে ইসলাম থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং মুফতিয়ে আজম হিন্দের খলিফা ছিলেন। তিনি অনেক কিতাব প্রণেতা এবং মাসিক 'নূরী কিরণ' বেরেলী-র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত ১৪টি কিতাব ও পুস্তিকার মধ্যে 'শাময়ে শবিস্তানে রযা' এবং 'শাময়ে শবিস্তান নূরী' ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছে। ৬ই রবিউস সানি ১৪২৫ হিজরিতে তাঁর ওফাত হয়। মাজার শরীফ তার জন্মস্থানেই অবস্থিত। (সূফী ইকবাল আহমদ নূরীর জীবন ও কর্মের সারসংক্ষেপ)

ইসলামের প্রাজ্ঞ আলেমগণ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ:

(৭) হযরত মাওলানা হাফিজুল্লাহ ফরঙ্গী মহল্লী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ: তাঁর জন্ম ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ-এর এক জ্ঞানদীপ্ত পরিবারে হয়েছিল এবং ২০শে রবিউস সানি ১২৭৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। লক্ষ্ণৌ-এর মাওলানা আনোয়ারুল হক ফরঙ্গী মহল্লী উদ্যানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। তিনি অধ্য সালতানাতের পক্ষ থেকে ফয়জাবাদ অঞ্চলের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। আদালতের ব্যস্ততার পাশাপাশি জীবনভর জ্ঞানদান ও শিক্ষা বিস্তারের কাজও করে গিয়েছেন।

(তাযকিরায়ে ওলামায়ে হিন্দ, পৃষ্ঠা: ১৬৭)

(৮) মুনাজিরে ইসলাম মাওলানা আল-এ হাসান মোহানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ: তাঁর জন্ম আনুমানিক

১২০২ হিজরিতে এবং ইন্তেকাল ১৭ই রবিউস সানি ১২৮৭ হিজরিতে হয়েছিল। ভারতের উন্নাও জেলার মোহান জনপদের স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। তিনি একজন বিখ্যাত আলেম, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, খ্রিস্টধর্মের প্রচারকদের সাথে তর্কে বিজয়ী এবং বিতর্ক শাস্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। কাদরীয়া কামিছিয়া তরীকায় তিনি আল্লামা আনোয়ারুল হক ফরঙ্গী মহল্লী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুরিদ ছিলেন। তিনি দিল্লীতে ওকালতি পেশায় যুক্ত ছিলেন এবং কিছুকাল হায়দ্রাবাদ রাজ্যের একটি উচ্চপদেও দায়িত্ব পালন করেছেন। 'তানকীহুল ইবাদাত' ও 'আল-ইস্তিপসার' তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

(মাসিক মা'আরিফে রেযা, নভেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৪ থেকে ৩৬)

(৯) বিজ্ঞ আলেম শেখ আল্লামা আব্দুল হক জাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ: তাঁর জন্ম মক্কাতুল মোকাররমায় ১২৮৫ হিজরিতে হয়েছিল। তিনি তাঁর নানা ইমাম মুহাম্মদ নববী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এবং মক্কার অন্যান্য আলেমদের থেকে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেছেন। তিনি হাফেজে কুরআন, অত্যন্ত মেধাবী যুবক, যৌক্তিক ও নকলী (ঐতিহ্যগত) জ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং মক্কার শিক্ষক ছিলেন। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁর থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেছে। তাঁর রচিত কিতাব 'তাদরীজুল আদানী ইলা কিরায়াতে শারহুত তাফতাজানী' শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্য হিসেবে সমাদৃত। ১৯শে রবিউস সানি ১৩২৪ হিজরিতে তাঁর ওফাত হয় এবং জান্নাতুল মুয়াল্লা কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। (তুহফাতুর রাবী, ১৩ পৃষ্ঠা / ফয়জুল মালিকুল মুতাআলী, ১১৩৬ পৃষ্ঠা / নাশরুন নূর, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

(১০) মুস্তাফতীয়ে আলা হযরত মাওলানা মিয়াঁ আহমদ শেখ খাকী কাদরী সোহরাওয়ার্দী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ: তাঁর জন্ম শেখ গোত্রে হয়েছিল। দ্বীনি শিক্ষা ও তাসাউফের জ্ঞান আপনি পীর ও মুরশিদ মাওলানা মিয়াঁ মুহাম্মদ বখশ পান্ডোরভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে অর্জন করেছেন। তিনি পাঞ্জাবী, ফার্সি এবং উর্দু ভাষার কবি ছিলেন; তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'খাকী'। তিনি একজন চমৎকার লিপিকার ছিলেন, নিজ হাতে ৭টি কুরআন শরীফ লিখেছেন। তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও জ্ঞান অনুযায়ী আমলকারী আলেম ছিলেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও পরহেজগার ছিলেন এবং তাঁর ১৩টি রচিত কিতাব রয়েছে। ২৩শে রবিউস সানি ১৩৪৩ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন। রাওয়ালপিন্ডি জেলার গুজর খান উপজেলার মোহরি রাজগানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

(গুজর খানের সোহরাওয়ার্দী মাশায়েখ, ৫৪৯ থেকে ৫৬২ পৃষ্ঠা)

(১১) রিয়াজুল মিল্লাত, শায়খুল হাদীস ওয়া তাফসীর হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন কাদরী চিশতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ: তাঁর জন্ম ১৩৫১ হিজরিতে আটোক জেলার লঙ্গর নামক স্থানে হয়েছিল এবং ১৩ই রবিউস সানি ১৪২১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম, মুহাদ্দিসে আজম পাকিস্তানের ছাত্র ও মুরিদ এবং তাঁর খলিফা ছিলেন। তিনি একজন কুরআনের ব্যাখ্যাকার (তাফসীরে রিয়াজুল কুরআন ও রিয়াজুল ঈমান তরজমার প্রণেতা), সফল শিক্ষক এবং অসংখ্য ছাত্রের উস্তাদ ছিলেন। শায়খে তরিকত, আটোক জেলার আস্তানা-এ-আলীয়া ফয়জাবাদ শরীফের প্রতিষ্ঠাতা, না'ত সংকলনের অধিকারী কবি এবং প্রায় ৫০টি কিতাবের লেখক। (তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত জেলা আটোক, পৃষ্ঠাঃ ৩৭২ থেকে ৩৭৮)

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়িল

মুফতি ফুযাইল রেযা আত্তারী

(১) ইহরাম অবস্থায় নারীর অলঙ্কার পরিধান করা কেমন?

প্রশ্ন: দ্বীনের আলেম এবং উজ্জ্বল শরীয়তের মুফতি সাহেবগণ এই মাসআলা সম্পর্কে কী বলেন যে, ইসলামী বোন কি ইহরাম অবস্থায় অলঙ্কার পরিধান করতে পারেন কি না?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: ইসলামী বোন ইহরাম অবস্থায় অলঙ্কার পরিধান করতে পারেন, কারণ নারীর জন্য ইহরাম অবস্থায় অলঙ্কার পরিধান করা নাজায়েয ও গুনাহ নয়। তবে এটি বর্জন করা উত্তম, কেননা অলঙ্কার সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত আর ইহরাম অবস্থায় সাজসজ্জা করা মাকরূহে তানযিহী।

وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) নামাযে কোনো শরয়ী কারণ ছাড়াই কিয়াম বর্জন করার বিধান

প্রশ্ন: দ্বীনের আলেম এবং উজ্জ্বল শরীয়তের মুফতি সাহেবগণ এই মাসআলা সম্পর্কে কী বলেন যে, কিছু মহিলাদের দেখা যায় তারা চার রাকাত ফরয নামাযের শুধুমাত্র প্রথম দুই রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করেন, অথচ শেষ দুই রাকাতে দাঁড়ান না, কোনো শরয়ী কারণ ছাড়াই বসে বসে আদায় করেন। জানতে চাই নামাযের মধ্যে মহিলাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা কি আবশ্যক নয়? আর যদি আবশ্যক হয়, তবে যারা এভাবে নামায আদায় করেন তাদের নামাযের বিধান কী হবে? দয়া করে পথনির্দেশ প্রদান করুন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: চার রাকাত ফরয নামাযের প্রতিটি রাকাতেই কিয়াম করা ফরয। যদি এক রাকাতও শরয়ী কারণ ছাড়া বসে আদায় করা হয় তবে নামায হবে না। আর এই মাসআলায় পুরুষদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র নিয়ম নেই বরং নারীদের ওপরও পুরুষদের ন্যায় ফরয নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া ফরয। দ্বীনি জ্ঞান থেকে দূরে থাকার কারণে কিছু নারী এমনটি করে থাকেন, কিন্তু তাদের এই কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেও সঠিক নয়। তাদের জন্য আবশ্যক হলো পূর্ণ চার রাকাত কিয়ামের সাথে আদায় করা এবং শরয়ী কারণ ছাড়া কিয়াম বর্জন না করা। আর যতগুলো নামায এভাবে কোনো শরয়ী কারণ ছাড়া বসে

আদায় করেছেন অথবা যেকোনো একটি রাকাতেও কিয়াম বর্জন করেছেন, ফরয ছেড়ে দেওয়ার কারণে সেই সকল নামায আদায় হয়নি। তাদের ওপর আবশ্যক হলো এই নামাযগুলো পুনরায় পড়া এবং মহান আল্লাহর দরবারে তওবা করা।

দ্রষ্টব্য: ফরয, ওয়াজিব এবং ফজরের সুন্নতের প্রতিটি রাকাতেই কিয়াম ফরয। এগুলো ছাড়া অন্যান্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও নফল নামাযে কিয়াম ফরয নয়। সুতরাং এই নামাযগুলো যদি কোনো পুরুষ বা নারী কোনো কারণ ছাড়াও বসে পড়েন তবে কোনো অপছন্দনীয়তা ছাড়াই নামায হয়ে যাবে এবং পুনরায় পড়ারও প্রয়োজন নেই। তবে কিয়ামে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে কিয়ামের সাথে আদায় করা উত্তম এবং পূর্ণ সওয়াব লাভের কারণ।

সতর্কবার্তা! সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাযের একটি প্রকার হলো তারাবীহ নামায। এটিও সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং এটি কারণ ছাড়া বসে পড়া যাবে কি না এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কিছু আলেমের মতে ফজরের সুন্নতের ন্যায় এটিও কারণ ছাড়া বসে পড়া যাবে না, কিন্তু সঠিক মত হলো তারাবীহ নামায ওজর ছাড়াও বসে পড়া যেতে পারে, তবে বসে পড়া মাকরূহে তানযিহী।

وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রবিউস সানির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

তারিখ/মাস/সন	নাম/ঘটনা	অধিক তথ্যের জন্য পড়ুন
৫ রবিউস সানি ৯৫৩ হিজরি	ওরস দিবস: হযরত আল্লামা সৈয়দ ইব্রাহীম ইর্চি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি
৬ রবিউস সানি ১৩৭০ হিজরি	ওফাত দিবস: আলা হযরতের খলিফা, ফকিহ-এ আজম মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিসে কোটলাভি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি
১১ রবিউস সানি ৫৬১ হিজরি	ওরস দিবস: বড়পীর শেখ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৩৮ থেকে ১৪৪৫ হিজরি এবং "বড়পীরের জীবনী"
১৭ রবিউস সানি ৭০১ হিজরি	ওফাত দিবস: ওলীয়ে কামেল হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ দুলহা সাবজাওয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি
১৮ রবিউস সানি ৭২৫ হিজরি	ওফাত দিবস: মাশায়েখদের সম্রাট হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি
২১ রবিউস সানি ১২৫২ হিজরি	ওফাত দিবস: হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবিদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি
২৫ রবিউস সানি ১০৪৬ হিজরি	ওফাত দিবস: কুতুবে আলম হযরত সৈয়দ আলম শাহ বুখারী সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৪১ হিজরি
২৯ রবিউস সানি ৬২৭ হিজরি	ওফাত দিবস: মহান সূফী হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন মুহাম্মদ আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৪১ হিজরি
রবিউস সানি ৪ হিজরি	মোবারক ওফাত: উম্মুল মুমিনীন হযরত বিবি জয়নব বিনতে খুজায়মাহ رَضِیَ اللہُ عَنْهَا	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৩৮, ১৪৩৯ হিজরি এবং "উম্মুল মুমিনীনগণের বরকত"
রবিউস সানি ৬ হিজরি	মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ رَضِیَ اللہُ عَنْهُ অভিযানের শহীদগণ: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১০ জন সাহাবীকে যুল-কাসসা গোত্রের দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন; এই অভিযানে অধিকাংশ সাহাবী শহীদ হন।	মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানি ১৪৪২ হিজরি

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের ওপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"মাসিক ফয়যানে মদীনা"-র সংখ্যাগুলো দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড করে পড়ুন এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করুন।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭৩৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, **Maktaba Tul Madina Bangladesh**